১১-১৫ ডিসেম্বর, পাঁচদিনব্যাপী গণঅবস্থান

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক অসাধারণ নজির

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক অসাধারণ নজির গড়লেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে টানা পাঁচদিন (১১ ডিসেম্বর-১৫ ডিসেম্বর ২০১৪) লাগাতার গণঅবস্থানে শামিল হলেন তাঁরা। দিন-রাতের ২৪ ঘণ্টাকে দুটি পর্বে ভাগ করে নিয়ে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা এবং রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৮টা), প্রত্যেকদিন প্রতিটি পর্বে আহ্বায়ক ১৫টি সংগঠনের ছয় শতাধিক সদস্য-অবস্থানকারী মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। প্রকৃতি আর প্রশাসন উভয়ের রোষকে উপেক্ষা করে যে হার না মানা

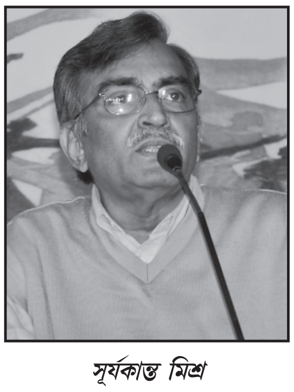

সূর্যকান্ত মিশ্র

মনোভাব নিয়ে প্রতিটি শিফ্‌টে আহ্বায়ক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা হাজির হচ্ছিলেন, তা দেখে মধ্য কলকাতার পথ চলতি মানুষও বিস্মিত হয়েছেন। কেউ কেউ স্বগতোক্তি ও করেছেন— এসবও সম্ভব? একরাত বা দু'রাত নয়, লাগাতার! কিন্তু এই আপাত অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করে তুলল ১৫টি সংগ্রামী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ। প্রতিটি সংগঠনই প্রত্যেক দিনের জন্য অবস্থানকারীর তালিকা প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু দেখা গেল সেই তালিকা ছাপিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে বলছেন আমরাও অবস্থান করব, আমরাও রাত জাগব। তাই প্রতিদিন দিনের বেলায় তো বটেই, এমন কি রাতেও যা থাকার কথা, থেকেছেন তার থেকে অনেক বেশি মানুষ। অস্থায়ীভাবে নির্মিত মণ্ডপে ভিড়ে ঠাসা অবস্থানের উত্তাপের কাছে হার মেনে ফিরে গেছে গঙ্গার হিমেল হাওয়াও। পাঁচদিনব্যাপী অবস্থানের বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও আহ্বায়ক

দীপক দাশগুপ্ত

সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য যেমন তাঁরা শুনেছেন, যেমন শুনেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, তেমনই নিজেরাও আলোচনা করেছেন, গান গেয়েছেন, আবৃত্তি করেছেন, নাটক করেছেন, স্লোগান দিয়েছেন, গণযাদু দেখিয়েছেন। সব কিছুর মধ্যেই ফুটে উঠেছে অধিকার অর্জন ও রক্ষার লড়াই-এর বার্তা, শ্রমজীবীদের ঐক্যকে অটুট রাখার শপথ।

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন কমিশন সহ ছ'দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল এই গণ অবস্থানের কর্মসূচী। ১৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এক যৌথ কনভেনশন থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী প্রায় একমাস প্রতিটি আয়োজক সংগঠন যেমন নিজেদের অনুগামীদের মধ্যে প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করে, তেমনই যৌথভাবে প্রচারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছে। কারণ, যে ছ'দফা দাবিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা শুধু শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি নয়, খেটে খাওয়া গরীব

মনোজ কান্তি গুহ

মানুষ, কর্মহীন যুবক-যুবতী, পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী-সকলেরই দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল এই দাবি সনদে। তাই শ্রমিক কর্মচারীরা রাত জেগেছিলেন শুধু নিজেদের স্বার্থে নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষের স্বার্থে।

১২ ডিসেম্বর প্রতিটি আয়োজক সংগঠন, দাবিগুলি বিবেচনার জন্য পৃথক পৃথকভাবে চিঠি দেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু যথারীতি সরকারের তরফ থেকে জবাব দেওয়ার কোনো সৌজন্য দেখানো হয়নি। ফলে অবস্থানকারীদের জেদ আরও বেড়েছে। তাঁরা চিৎকার করে বলেছেন যতক্ষণ না সরকার সদুত্তর দিচ্ছে, আমরা রাস্তা ছাড়ব না। হয়ত এমনভাবেই আরও দীর্ঘস্থায়ী হত অবস্থান কর্মসূচী। যদি না বিরোধী দলনেতা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটি দিতেন। তাঁর পরামর্শ ছিল, যে রাজ্যে সরকার আছে বলেই মনে হচ্ছে না, সেখানে শুধু অবস্থান করে দাবি আদায় করা যাবে না। দাবি আদায় করতে হলে যেতে হবে আরও প্রত্যক্ষ কর্মসূচীতে, প্রয়োজনে ধর্মঘটে। তাঁর পরামর্শে আহ্বায়ক সংগঠনগুলি আরও বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে অবস্থান কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করে।

পাঁচদিনব্যাপী অবস্থানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। বিশেষ করে পঞ্চম দিনের সমাবেশের ব্যাপ্তি প্রমাণ করেছে পশ্চিমবাংলা রয়েছে পশ্চিম বাংলাতেই। □

(বিস্তারিত সংবাদ চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

গত ৫ ডিসেম্বর সারা দেশেই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহের ডাকে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে কলকাতায় রানী রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে গণঅবস্থান ও সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন কেন্দ্রীয় সরকার, আর এরাজ্যের সরকার দু'পক্ষেরই আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী। ওরা শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ আন্দোলনের রাস্তায় নেমেছেন। আগামীদিনে গ্রাম-শহর মিলে এমন আন্দোলন হবে যাতে সরকার বাধ্য হবে পিছু হটতে।

সমাবেশে সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন যুদ্ধই চাইছে তখন শ্রমিক-কর্মচারীরাও রাস্তায় নেমেছেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা এর মোকাবিলা করবেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার শহরে একটি ঝুপড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। রাজ্যের এক মন্ত্রী এসে ক্ষতিপূরণের

শ্যামল চক্রবর্তী

কোন কথা তো বললেনই না, উলটে বলে গেলেন বস্তিকে রেখে শহরের উন্নয়ন করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে কর্মহীনতা। দলে দলে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছেন। শহরে যেখানে পারছেন সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিচ্ছেন। এ এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ফলে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল। এতে গ্রামের মানুষ খানিকটা স্থিতি পেয়েছিল। এখন তো কেন্দ্রীয় সরকার জনকল্যাণমূলক কাজই সঙ্কুচিত করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে গত দু-বছরে ১০০ দিনের কাজ করে মানুষ কোন অর্থ পাননি। দেনার দায়ে মানুষ বাধ্য হচ্ছেন আত্মহত্যা করতে, গত ৩৪ বছরে যা কোনদিনই হয়নি।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হরণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেইজন্য শ্রম আইন বদল করতে চাইছে। শ্রমনীতি তৈরি করতে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিল্পপতিদের, ট্রেড ইউনিয়গুলির

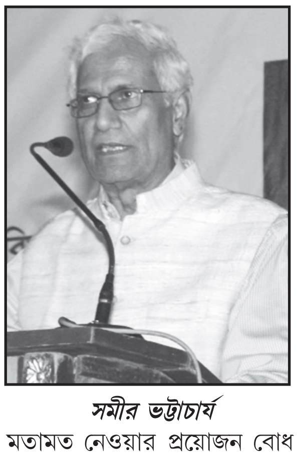

সমীর ভট্টাচার্য

মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট বাতিল করছে। এরফলে ৮ ঘন্টার বদলে শ্রমিক-কর্মচারীদের ১২ ঘন্টা কাজ করতে হবে। রাজস্থান সরকার তো একটা ভয়ঙ্কর আইন করতে চলেছে। তারা বলেছে কোন কারখানায় ৩০০ জন শ্রমিক থাকলেও লে-অফ করার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই। শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী এইসব কালা কানুন যখন কেন্দ্রীয় সরকার আনতে চাইছে, তখন শ্রমিক-কর্মচারীরাও চুপ করে বসে নেই। চা বাগানে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়েছে। তাদের সমর্থনে সমতলের মানুষও এগিয়ে এসেছিলেন। চটকল ধর্মঘট সফল হয়েছে। কয়লা শিল্পে ধর্মঘট হতে চলেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি। উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চলেছে রাজ্য সরকার। অথচ শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রেই টাকা নেই। আই সি ডি এস কর্মচারীরাও আন্দোলনে নেমেছেন। আগামীদিনে গ্রাম-শহর মিলিয়ে এমন আন্দোলন হবে, যাতে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়।

সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত বলেন, এরাজ্যে তৃণমূল সরকার যত আক্রমণ নামিয়ে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন

সর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধক তপন সেন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর চণ্ডীগড়ের জিরেকপুরের সোহী কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা দেশের মধ্যে ২৩টি রাজ্যের ২৬টি সংগঠন এই সম্মেলনে যোগদান করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৯৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২০ ডিসেম্বর শহীদবেদীতে মাল্যদান ও

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার

ডিসেম্বর ২০১৪

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

৪৩ তম বর্ষ □ অষ্টম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

এবার শুরু হোক আরও ঐক্যবদ্ধ আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের প্রস্তুতি

বেশ কিছু বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবচনই বর্তমান রাজ্য সরকারের চরিত্র ও কাজের সাথে মানানসই। যেমন 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো' বা 'দুকান কাটা' ইত্যাদি। ন্যূনতম দায়িত্ববোধ, কাণ্ডজ্ঞান, লজ্জা, মান-মর্যাদা প্রভৃতি যে যে বিষয়গুলি একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের থাকা প্রয়োজন, তার সবগুলিকেই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে শ্রীমতী-শ্রীমানেরা ক্ষমতায় এসে বসেছেন। এর ফল যা হবার তা-ই ঘটছে প্রতিদিন। কিন্তু এঁরা যদি শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তি-মানুষ হতেন তাহলে বলার কিছু থাকত না। কারণ কোন মানুষ যদি মনে করেন যে দায়িত্ববোধ, কাণ্ডজ্ঞান, লজ্জা, আত্মসম্মান এগুলি সবই বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহলে তাঁর ওপর ঘৃণা বা অনুকম্পা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য অন্য কারও খুব বেশি ক্ষতি হবার কোনো সুযোগ নেই।

তবে এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (অথবা বলা ভাল চরিত্র বিযুক্ত) কয়েকজন মানুষ (মতান্তরে অমানুষ) যদি একজোট হয়ে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং সেই দল যদি ঘটনাচক্রে শাসন ক্ষমতা দখল করে, তখন সমূহ বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়। আমাদের রাজ্যের মাথায় ঠিক এই ধরনের বিপদের খাঁড়াই এখন ঝুলছে, কারণ গত সাড়ে তিনবছরের কিছু বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকারে যারা আসীন রয়েছে, সেই মুখগুলোর দিকে তাকালে বা তাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করলে (একক বা দলগত যাই হোক না কেন), উপরোক্ত প্রতিটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নজরে আসবেই।

লজ্জা বা আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে। ব্যক্তিগত, দলগত বা প্রশাসনিক, কোন ধরনের সততারই যে এরা ধার ধারে না, তা প্রমাণ করার জন্য আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমে এদের দুর্নীতির নতুন নতুন চ্যাপ্টার উন্মোচিত হচ্ছে। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে মন্ত্রিসভার বৈঠক জেলখানার অভ্যন্তরেই সারতে হবে। অথচ ক্ষমতায় আসার আগে এরাই নিজেদের সততার প্রতীক বলে জাহির করত। কিন্তু এরা যে শুধু দুর্নীতির পাঁকেই ডুবে রয়েছে তা নয়, রাজ্যবাসী কোনো অংশের মানুষের প্রতিই এদের ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নেই। কথায় বলে নুন খেলে গুণ গাইতে হয়। কিন্তু সে বালাই তো তাদের, যাদের শরীরের যথা স্থানে দুটি কান থাকে। আর যাদের দু'কান কাটা, তারা নুন খেলেও গুণ গাইবার কষ্ট করতে নারাজ। তাইতো জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও, দু'চারজন চিটফান্ডের মালিক ছাড়া আর সকলেই আজ এদের কাছে অপাংক্তেয়।

কৃষককে ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। গ্রামে 'রেগা'-র কাজের অবস্থাও তথৈবচ। শ্রমিকের মুখের ওপর কারখানা লক-আউটের নোটিশ ঝুললেও, মালিককে ডেকে এনে আলোচনার টেবিলে বসিয়ে কারখানা খোলার কোনো মানসিকতাই নেই। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের কোন পরিকল্পনাও নেই, পরিবেশও নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মস্তানরাজ আর গণ টোকাটুকির জমজমাট আসর। সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা আর নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তারা মাইনে পায় সরকারী তহবিল থেকে কিন্তু শাসকদলের তাঁবেদারি করতে বাধ্য হয়। এমনকি বঞ্চনার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরসহ রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতন পান এমন সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন প্রভৃতি ন্যায্য দাবিগুলি ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের কোন হেলদোল নেই। সরকারী কর্মসূচী বলতে এখন শুধু কিছু চটকদারী অনুষ্ঠান, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভাঁওতা আর হুমকি। হুমকির ক্ষেত্রে আবার ভাষা লাগামহীন। কার্যত জঙ্গলের অরাজকতা গোটা রাজ্যজুড়ে।

দুঃখের হলেও সত্যি, যে রাজ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত শান্তি, সম্প্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, জনস্বার্থবাহী উন্নয়ন প্রভৃতির মাপকাঠিতে সারা দেশে তো বটেই এমনকি দেশের বাইরেও বারবার প্রশংসিত হত, সেই রাজ্যেরই আজ এই হাল। তবে একটা ভাল দিকও রয়েছে। যাঁরা মনে করেছিলেন এরা ক্ষমতায় এলে নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে—তাঁদেরও মোহভঙ্গ ঘটছে। ফলে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সচেতনতার মান এতটাই উঁচু যে বিশৃঙ্খলার মেঘ দিয়ে সেটাকে বেশিদিন ঢেকে রাখা যায় না। যাচ্ছেও না। তাই কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুব সকলেই আবার রাস্তায় নামছেন। রাস্তায় নামছেন, নেমেছেন শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। প্রতিকূলতার পারাবারকে অতিক্রম করার জন্য নির্মিত হচ্ছে ঐক্যতরী। এমনই এক সুদৃঢ়, গতিসম্পন্ন ঐক্যতরীর মহড়া হয়ে গেল গত ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ধর্মতলায় পাঁচ দিনব্যাপী লাগাতার গণঅবস্থানে। ছ'দফা দাবির ভিত্তিতে আহুত নজির সৃষ্টিকারী এই গণ অবস্থানের মেজাজ বুঝিয়ে দিল লোহা গরম হতে শুরু করেছে। এবার প্রয়োজন মোক্ষম এক হাতুড়ির আঘাত হানার মতন শক্তি সঞ্চয়। গণঅবস্থানের সাফল্যকে সংহত করে শুরু হোক সেই চূড়ান্ত যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতি। □

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪

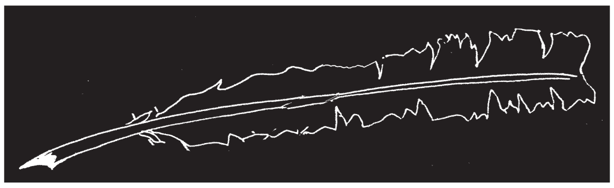

'ট্যুরিস্ট স্পট'

যীশু খ্রিষ্টের জন্ম দিবস ও ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিবসের মধ্যবর্তী দিবসগুলিতেও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দুই চক্ষু ভরিয়া অবলোকন করিবার সহজাত বাসনা বঙ্গবাসীর রহিয়াছে। স্বভাবতই উক্ত দিবসগুলিতে প্রায় প্রতিটি দ্রষ্টব্য স্থানেই জনসমাগম হয় বিপুল। কেহ বা নিছক উপভোগ করিবার তাগিদে, কেহ বা বনভোজনের বাসনায় সমবেত থাকেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আলিপুর চিড়িয়াখানা, মিলেনিয়াম পার্ক, নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি প্রভৃতি এমনই কয়েকটি কলকাতা কেন্দ্রিক দ্রষ্টব্য স্থান বা ট্যুরিস্ট স্পট।

ফি বৎসর যাইলেও, এগুলি সম্পর্কে মানুষের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না, একথা যেমন সত্য, তেমনি নিশ্চিতভাবে ইহাও সত্য যে, এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃত নূতন ট্যুরিস্ট স্পট দেখিবার সহজাত আগ্রহও মনের কোণে বাসা বাঁধে। কিন্তু চাহিলেই ট্যুরিস্ট স্পট মাটি ফুঁড়িয়া আত্মপ্রকাশ করে না। যে কোন স্থানকেই ট্যুরিস্ট স্পট বলিবার উপায় নাই। প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অপরূপ স্থাপত্যকলা সহ বিশেষ বিশেষ গুণাবলী বহন করিলেই 'ট্যুরিস্ট স্পট'-এর তকমা জুটিতে পারে। দীর্ঘকাল শীতকালীন ভ্রমণহেতু সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থানে ঘুরপাক খাইবার পর অবশেষে বঙ্গবাসীর স্বাদ বদলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্ট হইয়াছে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রচার পাইলে অদূর ভবিষ্যতে একটি নূতন ট্যুরিস্ট স্পট আলিপুর চিড়িয়াখানার জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সামর্থ্য ধরিবে। পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিরসন করিবার জন্য জানাই— সম্ভাব্য 'ট্যুরিস্ট স্পট'গুলি হইল কলকাতাস্থিত কয়েকটি কারাগার। উক্ত কারাগারগুলি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হইলেও, স্বাধীনোত্তর পর্বে, এযাবৎকাল এগুলি অপরাধীদিগের বন্দীশালা বা পুনর্বাসন কেন্দ্র রূপেই বিবেচিত হইত।

স্বভাবতই ভ্রমণবিলাসী মানুষের এগুলির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হইবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বন্দীশালাগুলির কিঞ্চিৎ চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশেষ শ্রেণীভুক্ত এক অপরাধী গোষ্ঠীর দন্ডমুন্ডের কর্তাগণ ক্রমান্বয়ে উক্ত কারাগার সমূহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠগুলিকে আলোকিত করিয়া প্রবেশ করিতেছেন। আরও অনেকেই দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষমাণ। বিচারের বাণী ডাক পাঠাইলেই প্রবেশ করিতে হইবে। উহাদের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিবার কারণ দ্বি-বিধ। প্রথমত, জনসেবার্থে নির্বাচিত হইলেও, উক্ত বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত অপরাধীগণ জনসেবার পরিবর্তে 'চিট-সেবায়' নিজেদেরকে কায়মনবাক্যে নিয়োজিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দাগণ কখনও স্বীয় প্রজাতির ক্ষতিসাধন করে না। কিন্তু আলিপুর কারাগারের বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাগণ 'মিত্র' সাজিয়া স্বীয় প্রজাতির পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিয়াছেন।

এইরূপ গুণবানদিগকে বন্দীশালায় দেখিবার সুযোগ বঙ্গবাসীগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই বন্দীশালাগুলিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য দুই দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন 'কাকচিত্র' অঙ্কণে পারদর্শী এক শিল্পীকে (উক্ত বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত) দ্রুত গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ। যাহাতে তিনি কারাগারের দেওয়ালগুলিতে 'কাক' সহ বিভিন্ন পশুপক্ষীর চিত্র অঙ্কন করিয়া আলিপুর চিড়িয়াখানার ন্যায় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিশেষ গোষ্ঠীর যিনি গোষ্ঠীপ্রধান, তাঁহার 'বংশদণ্ড' অতীব প্রিয় বস্তু। তাঁহার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিবার লক্ষ্যে কারাগারগুলিকে বংশদণ্ডের কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে ত্রিফলা আলোকে আলোকিতও করা যাইতে পারে। গোষ্ঠীপ্রধানের তাৎক্ষণিক নামকরণের পারদর্শিতাও রহিয়াছে। নয়ারূপে সজ্জিত কারাগারগুলিকে তিনি 'নয়া বাঁশের কেল্লা' রূপে নামাঙ্কিত করিতে পারেন। বারাসতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। নয়া বাঁশের কেল্লা হউক অপরাধীদিগের তীর্থস্থান। □

১৫ পৌষ, ১৪২১

শোক সংবাদ

আনন্দ পাঠক

গত ২৮ নভেম্বর ভোরে শিলিগুড়ির এক নার্সিং হোমে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড আনন্দ পাঠক প্রয়াত হন। তার বয়স হয়েছিল ৮৫।

দার্জিলিং জেলায় চা বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

কমরেড আনন্দ পাঠকের সারা জীবন ছিল সংগ্রাম ও লড়াই আন্দোলনে পরিপূর্ণ। তিনি তিনবার লোকসভায়, একবার রাজ্য সভা ও একবার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের সময় সোনাদায় তার বাড়ী ভস্মীভূত হয় ও তিনি দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে শিলিগুড়িতে আশ্রয় নেন।

তিনি ছিলেন সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির ও রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য। এছাড়া দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক। পাহাড়, তরাই সমতল মানুষের মধ্যে ঐক্যের জন্য তার সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। □

রক্তদান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচী হিসাবে গত ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ স্থানীয় কর্মচারী ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচীটি উদ্বোধন হয়। জেলা সংগঠনের সভাপতি রঙ্গলাল মাইতি সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন রায় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় দেবেন মাইতি সদর হাসপাতালের ডাক্তার মহোদয়া ডাঃ সান্ত্বনা দত্ত। সংগঠনের প্রবীণ নেতৃবৃন্দসহ সর্বমোট ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। জেলা ও মহকুমাস্তরের নেতৃবৃন্দ, কর্মচারী ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ। জেলা দপ্তরের সর্বক্ষণের কর্মী সহ মোট ৩৮জন (৩ জন মহিলা) রক্তদান করেন। □

পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৭/৮/২০১৪ তারিখ বুধবার রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। জেলা কমিটির সভানেত্রী সীমা সাহা এবং সহসভাপতি রবীন্দ্র প্রসাদকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভার শুরুতে প্রয়াত শহীদ কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন রক্তদান উপসমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক উত্তম দাস, সমিতির জেলা সম্পাদক কৃতজিৎ চ্যাটার্জী এবং উদ্বোধক জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী। পরিবার পরিজন সহ মোট ৩৯ জন রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে ৪জন মহিলা ছিলেন। □

আলোচনা সভা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পুরুলিয়া জেলা শাখার শিক্ষা উপসমিতির উদ্যোগে বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক আলোচনা সভা আহ্বান করে। গত ৯ নভেম্বর, ২০১৪ কর্মচারী ভবনে এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় "নয়া উদারনীতির আলোকে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও শ্রমজীবীদের দায়িত্ব", আলোচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার অন্যতম সহ সম্পাদক ও শিক্ষা উপসমিতির সদস্য রামাশিস অধিকারী। সভাটি পরিচালনা করেন শিক্ষা উপসমিতির আহ্বায়ক প্রচেতা কুমার দাস।

জেলার ২১টি অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জেলার ১৯টি ব্লক কমিটির সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক ও একটি মহকুমা কমিটির (রঘুনাথপুর) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সর্বমোট ৯৮ জন এই আলোচনা সভাতে অংশগ্রহণ করে। □

পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও তিন হাজারের উপর কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশে সম্মেলন উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। এছাড়াও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কনফেডারেশনের চেয়ারম্যান এম এস রাজা, সি আই টি ইউ-র পাঞ্জাব রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঘুনাথ শর্মা, বি ই এফ ই'র সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বিশ্বাস, নেপাল ও বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধি প্রমুখ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ইংরেজিতে এস শ্রীকুমার এবং হিন্দীতে সুভাষ লাম্বা। মহিলা অধিবেশনে হিন্দীতে প্রতিবেদন পেশ করেন সুতপা হাজরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজয় শংকর সিনহা ও বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর এবং শিখা মুখার্জী মহিলা অধিবেশনে প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। মহিলা অধিবেশনের জবাবী ভাষণ দেন হরিয়ানার সবিতা। প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ দেন সুকোমল সেন।

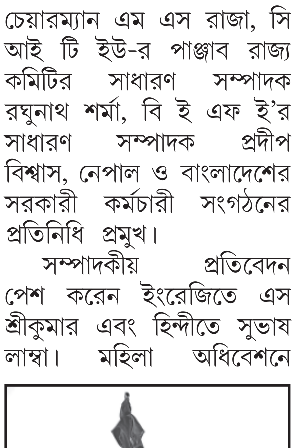

রক্ত পতাকা উত্তোলন করছেন সুকোমল সেন

এছাড়াও নীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাবসহ ১৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নব নির্বাচিত পদাধিকারী ঃ **চেয়ারম্যান ঃ** মুখু সুন্দরম (তামিলনাড়ু) **অনারারি প্রেসিডেন্ট ঃ** আর জি কার্নিক (মহারাষ্ট্র), **সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ঃ** সুকোমল সেন, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** এস শ্রীকুমার (কেরল), **সহকারী সাধারণ সম্পাদক ঃ** মঞ্জুল দাস (বিহার), সুভাষ লাম্বা (হরিয়ানা)।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে মনোজকান্তি গুহ অন্যতম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। **সম্মেলনের বিস্তারিত রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।** □

ধর্মস্থানের ধ্বংসসাধন

রোমিলা থাপার

ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে পবিত্র তীর্থস্থান বা ধর্মীয় স্থানগুলির ধ্বংসসাধন বা আক্রান্ত হবার ঘটনার পিছনে একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই কারণ হিসেবে কাজ করেছে এমন ভাবলে ভুল হবে। লোভ ও ক্ষমতার দম্ভও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান। বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধনের পিছনে ধর্মীয় শত্রুতার থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাসনা অনেক বেশি কাজ করেছে।

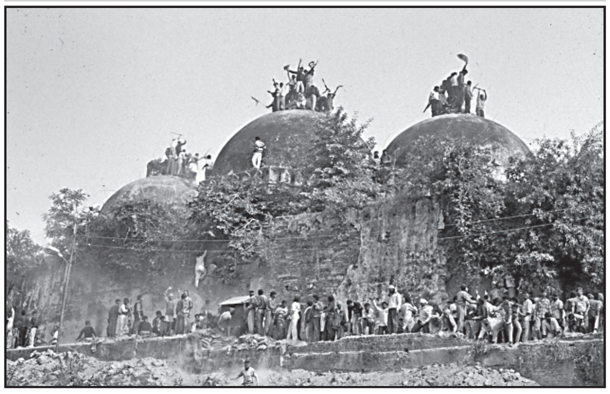

বাবরি মসজিদ ধ্বংসসাধনের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত আব্দুল গফুর নুরানির গবেষণামূলক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি আমি সবেমাত্র পড়া শেষ করেছি। আগের দুটি খণ্ডে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা এবং তৎকালীন মতামত ও বিতর্কগুলিকে তুলে ধরা হয়েছিল। তৃতীয় খণ্ডটিতে আলোচনাকে টেনে আনা হয়েছে সাম্প্রতিকতম সময় পর্যন্ত এবং এই সময়কালে প্রকাশিত আদালতের রায়গুলিকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক কথায় বইটি মূল বিষয়গুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য সহ। কেন ইতিহাসে বারবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মস্থানগুলি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এই সম্পর্কে আমার পূর্বতন ভাবনাকে আরও একবার ঝালিয়ে নেবার সুযোগ করে দিল এই বইটি। কেন ঘটেছিল বাবরি মসজিদের ঘটনা, তা বুঝতে হলে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ঐ ঘটনাকে বিচার করতে হবে। প্রেক্ষিতটি হল, একটি ধর্ম, এমনকি যে নিজেকে সহনশীল ও অহিংস বলে দাবি করে, অন্তত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলিতে তাই লেখা থাকে, কখনও কখনও অন্য ধর্মমতের প্রতি হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। যখন এমন ঘটে তখনই ধর্মীয় স্থানগুলির রূপান্তর ঘটে অথবা অপবিত্র হয় বা কখনও কখনও ধ্বংস হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় এমন ধরণের কার্যাবলীর পিছনে ক্রিয়াশীল সমস্ত কারণগুলিকে খুঁজে বের করা। তা না করে কোন একটি বিশেষ কারণকেই শুধু আঁকরে ধরে থাকা ভ্রান্ত চিন্তার পরিণতি। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে কখনও অপরের ধর্মস্থানকে আক্রমণ করার স্পৃহা জন্মায় না।

বৌদ্ধ বনাম প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি

ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু শতাব্দী ধরে এই দ্বন্দ্ব চলেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে কখনও কখনও বৌদ্ধ স্তূপগুলিকে নির্মাণ করা হত প্রস্তর যুগের মানুষের সমাধি সংলগ্ন অঞ্চলে, এমনকি সমাধিস্থলকে দখল করেও। অথচ প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রস্তরযুগের মানুষ, যাঁরা মূলত ছিলেন উপদ্বীপসমূহের বাসিন্দা এবং যাঁদের সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি, তাঁরা তাঁদের মৃতদেহগুলিকে বিস্তৃত ও যত্নসহকারে নির্মিত সমাধিতে রেখে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দিয়ে সেগুলিকে চিহ্নিত করে রাখতেন। সমাধিস্থলে মৃতদেহের সাথে দৈনন্দিন ব্যবহার্য কিছু বস্তু রেখে দেওয়া হত, যা থেকে বোঝা যায় তাঁরা পরজন্মে বিশ্বাস করতেন। যে পরম যত্ন নিয়ে সমাধিস্থলগুলিকে সাজানো হত, তা থেকে বোঝা যায় এগুলি ছিল তাঁদের কাছে পবিত্র। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রখ্যাত তখ্‌ত্‌-ই-বাহি মঠটি জরাথুস্ট্রদের ধর্মস্থানের উপর নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সুতরাং বৌদ্ধ স্তূপগুলি কি ইঙ্গিত বহন করে? এগুলি কি প্রাচীনতর বিশ্বাসের পবিত্রতার সঙ্গলাভ করতে চায় না, কি ঘোষণা করতে চায় যে পুরানো ধর্মীয় বিশ্বাস কে সরিয়ে নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস জায়গা করে নিচ্ছে?

হিন্দু বনাম বৌদ্ধ

হিন্দু মন্দিরগুলির নির্মাণকাল আরও পরে, খ্রিস্টাব্দের গোড়ার কয়েকটি শতকে। এই সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন ছিল এইরকম— একদিকে ব্রাহ্মণ, অপরদিকে শ্রমণ (যার মধ্যে ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী বৌদ্ধ, জৈন ও নাস্তিকেরা)। এই বিভাজনটা ছিল সুস্পষ্ট যা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের সম্পর্ককে তুলনা করেছিলেন সাপ ও নেউলের সম্পর্কের সাথে। স্বভাবতই এই বৈরিতামূলক সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে পরিণত হত। কলহন, যিনি দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে, কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তাঁর লেখায় জানা যায় শৈব রাজারা বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংসের ফতোয়া জারি করেছিলেন এবং প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হয়েছিল।

কিছু কিছু বৌদ্ধ স্তূপকে ধ্বংস না করে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তর ঘটানো হয়েছিল। বৌদ্ধ স্তূপের অভ্যন্তরে প্রার্থনা কক্ষ যা চৈত্য কক্ষ নামে পরিচিত এবং যার এক প্রান্তে থাকে দীক্ষা গ্রহণের বেদী, সেগুলিকে সহজেই হিন্দু মন্দিরে রূপান্তর ঘটানো যায়। ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল ‘তের’, ‘সেজারলা’ প্রভৃতি স্তূপগুলির ক্ষেত্রে। কার্লেতে পাহাড় কেটে যে বৌদ্ধ মঠ তৈরি করা হয়েছিল, সেটির অভ্যন্তরে স্থাপিত দীক্ষা গ্রহণের বেদীটিকে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এর ফলে বৌদ্ধ মঠটি একটি শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছিল। যদিও ঔপনিবেশিক আমলে এদিকে পুনরায় বৌদ্ধ মঠ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন, এই রূপান্তরগুলি পবিত্রস্থানের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণ ও ‘শ্রমণ’দের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল, তার প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট, এগুলি দ্বিতীয় অংশকে সরিয়ে প্রথম অংশের দখলদারির নিদর্শন। এই দখলদারি ঐতিহাসিকদের নজরে যে পড়েনি তা নয়। কিন্তু এগুলিকে খুব বেশি গুরুত্ব তাঁরা দেন নি, কারণ তাঁদের অনেকেই মনে করেন, শ্রমণেরাও সামান্য কিছু পার্থক্য সহ বৃহত্তর হিন্দু ধর্মেরই অংশ। উভয় অংশের বিশ্বাস ও চর্চার বিপুল পার্থক্যের কারণে যে শত্রুতার বাতাবরণ ছিল, তাকে ঐতিহাসিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন।

এরপর উত্তর-পশ্চিম ভারতে এল তুর্কিরা। ধর্মের নামে কিছু হিন্দু মন্দিরকে অপবিত্র করা হল। ইসলাম ধর্ম ছিল মূর্তি পুজোর বিরোধী আর হিন্দু মন্দিরগুলিতে থাকত বিভিন্ন দেব-দেবীর মুর্তি। ঠিক কতগুলি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল, তার একটি প্রামাণ্য তথ্য ঐতিহাসিকরা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এবং প্রকৃত সংখ্যা হল, যা প্রচার করা হয়, তার ভগ্নাংশ মাত্র। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচারের সাথে আরও একটি কথা বলা হয়, তা হল প্রতিটি হিন্দু মন্দির ধ্বংসের বদলা নিতে হবে। যদিও এটা ঠিক, কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল, এবং কয়েকটি মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই মন্দির ধ্বংসের কারণ কি শুধুই এক পক্ষের অপর পক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তারের তাগিদ? না কি অন্য কোন কারণও এক্ষেত্রে কাজ করেছে?

আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্যি, কিছু হিন্দু ও মুসলিম নিজেরাই নিজেদের ধর্মস্থানকে অপবিত্র করেছে। কলহন কাশ্মীরের কিছু হিন্দু রাজার কথা লিখেছেন, যারা হিন্দু মন্দির লুট করত। এই কাজে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর হর্ষদেব নামে এক রাজা। তিনি দেবোপত্তনায়ক নামে এক আধিকারিককে নিয়োগ করেছিলেন। এই আধিকারিকের দায়িত্ব ছিল লুটের কাজ তদারকি করা। কলহনের ব্যাখ্যা ছিল, কাশ্মীর রাজাদের চূড়ান্ত আর্থিক সংকটই তাদের এই পথে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু লুটতরাজের যে ব্যাখ্যা কলহন দিয়েছেন তা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

মন্দির ধ্বংসকারী হিসেবে যার নাম সব থেকে বেশি শোনা যায় তিনি হলেন গজনির মাহমুদ। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দির ও তার অভ্যন্তরের দেব-মূর্তিটিকে ধ্বংস করেন। একইভাবে এই উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিমভাগের বেশ কিছু মন্দিরকে ধ্বংসের লক্ষ্যে আক্রমণ করেছিলেন। গজনীর মাহমুদের এই আচরণের কথা প্রায়শই আলোচনায় আনা হয়। কিন্তু যা বলা হয় না, তা হল, সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায়, গজনীর মাহমুদ মুলতান সহ বিভিন্ন জায়গায় মসজিদও ধ্বংস করেছিলেন। কারণ ঐ মসজিদগুলি ছিল শিয়াদের হাতে এবং সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মাহমুদ তাদের বিরোধী মতাবলম্বী ও শত্রু বলে মনে করতেন। যদিও শিয়ারাও ছিল মুসলিম। সমসাময়িক ইতিহাস বলছে, তিনি ৫০,০০০ কাফের ও সমসংখ্যক শিয়াকে হত্যা করেছিলেন। সংখ্যা দেখলে মনে হয় গাণিতিক সূত্রের সমাপতন।

ব্রিটিশ যুগ

এরপর এল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। তাদের মন্দির বা মসজিদ বা কোন ধর্মস্থানকেই ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়নি— কারণ ভারতে প্রচলিত ধর্মগুলি সম্পর্কে তারা অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করত। তাদের কাছে নিজস্ব স্বার্থই ছিল মুখ্য, ধর্মীয় বিষয় ছিল গৌণ। ব্রিটিশরা এসেছিল উপনিবেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং সম্পদ আহরণের তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল যা মন্দির লুট করে পাওয়ার থেকে অনেক বেশি সম্পদের সন্ধান তাদের দিয়েছিল। ধর্মীয় স্থাপত্যগুলিকে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই তারা বিবেচনা করত এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের লেখা পড়লেই তা জানা যায়। সুতরাং ব্রিটিশ আমলে প্রাচীন ধর্মস্থানগুলি সংরক্ষিত সৌধে পরিণত হল, যেমন বাবরি মসজিদ।

ধর্মস্থানগুলিকে যে কেউ এসে ভেঙে দিয়ে গেছে, বা রূপান্তর ঘটিয়েছে, এই পর্যন্ত বলে আলোচনা শেষ করে দেওয়া যথেষ্ট নয়। ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব হল এই ধরনের কাজের পিছনে যে কারণগুলি কাজ করেছে, সেগুলিকে খুঁজে বের করা এবং প্রমাণ ও যুক্তি নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করা। বহু কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, শুধুমাত্র কোন একটি ধর্মের বাঁধন বা বিধি-নিষেধ নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আন্ত: সম্পর্ক এবং যে ধর্মস্থানটিকে ধ্বংস করা হয়েছে বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, তৎকালীন সময়ে তাকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ভূমিকা প্রতিপালিত হত—এই সবকিছুর ভিত্তিতে বহুবিধ কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে ধর্ম মানে হল সম্প্রদায়গত বৈচিত্র এবং কখনও কখনও যা জাতি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত। সুতরাং কোন একটি আক্রমণের পিছনে কোন্ সম্প্রদায় যুক্ত ছিল, এটা জানা গেলে কারণ খোঁজা সহজ হবে। আক্রমণ বা আগ্রাসনের কোন ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর জন্য নয়, ভাল করে বোঝার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন ব্রাহ্মন-শ্রমণ দ্বন্দ্বে, সমকালীন গ্রন্থে শৈব সম্প্রদায়ের তৎপরতা একটু বেশি চোখে পড়ে। তাহলে কি শৈবরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশী আগ্রাসী ছিল। কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন।

ধর্মীয় বিদ্বেষকেই মন্দির ধ্বংসের মূল কারণ হিসেবে প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। যদি এটাই অবশ্যম্ভাবী কারণ হবে তাহলে আশ্চর্যের বিষয় হল শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের আরও বেশী পবিত্র ধর্মস্থানগুলিকে আগে ধ্বংস করা হল না কেন? আসলে সর্বাধিক পবিত্র ধর্মস্থানই যে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হবে তার কোন মানে নেই। সাধারণভাবে সেই মন্দিরগুলিই আক্রান্ত হয়েছে বা লুট হয়েছে, যেগুলিতে সোনা ও গয়নার প্রাচুর্য ছিল বা যেগুলি ছিল তৎকালীন রাজবংশের প্রতীক। সোমনাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে দেব-মূর্তি ছিল। সুতরাং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। দশম শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটি যে সুপ্রাচীন তা নয়, ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পদের দৌলতে মন্দিরটি ছিল বিপুল ধনী। পাশাপাশি গুজরাটের চালুক্য রাজারা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চালুক্য রাজকুমার পাল চালুক্য এটির পুনঃস্থাপনা করার পর থেকেই এটি চালুক্য রাজক্ষমতার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই কারণেই কি এটি পার্শ্ববতী অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় আক্রমণের সম্ভাব্য লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল?□

(অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ফ্রন্টলাইন, জানুয়ারি ৯, ২০১৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ

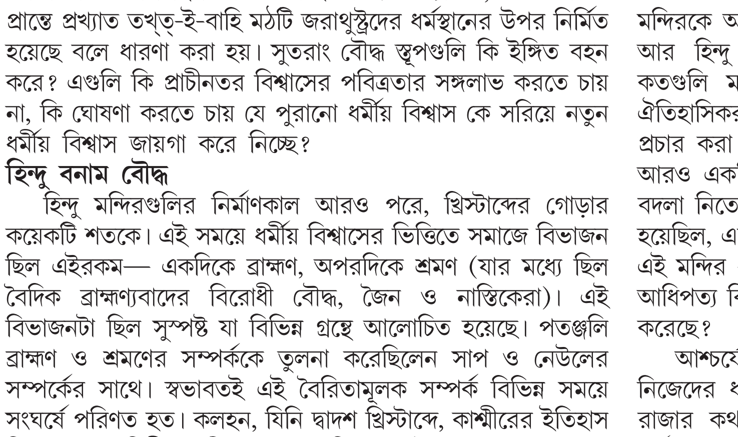

মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করছেন গীতশ্রী সরকার

গত ২৪ ডিসেম্বর এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা স্বয়ং রাজ্যপালের হাত থেকে বেস্ট গ্র্যাজুয়েট ও বেস্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ডিগ্রীর সার্টিফিকেট নিতে অস্বীকার করেন সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা। এর আগে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখান ছাত্র-ছাত্রীরা। সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট করে অনশন ধর্নায় বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হলে অনশন তুলে নেওয়া হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করেন এবং উপাচার্যের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রী প্রত্যাখ্যান শুরু করেন বেস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীর জন্য মনোনীত, স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, আর্টস ফ্যাকাল্টির এস এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদিকা গীতশ্রী সরকার। তিনি বিনম্রভাবে রাজ্যপালকে জানান, যে মঞ্চে এমন উপাচার্য রয়েছেন সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি ডিগ্রী নিতে পারব না। তাঁর প্রতিবাদের মধ্যেও আচরণ ছিল অত্যন্ত মার্জিত। বরং রাজ্যপালই তাঁকে ভর্ৎসনা করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। বেস্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ডিগ্রীর জন্য মনোনীত অর্থনীতির ছাত্র অগ্নিভ মজুমদারও বেঙ্গালুরু থেকে ই-মেলে ডিগ্রী প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়ে দেন। এমনকি কলাবিভাগে গতবছর রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন যশোধারা গুপ্ত। তিনিও এদিনের অনুষ্ঠানে এসে তাঁর পদক ফিরিয়ে দেন। আর্টস বিভাগে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীর এবার স্বর্ণপদক পাওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে ১১ জনই পদক প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন অধ্যাপকরাও। সমাবর্তন শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে থেকেই অনশনে বসেছিলেন অধ্যাপকেরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বা জুটার নেতৃত্বে এই অনশনে প্রথমে শামিল হন ২৫ জন। সমাবর্তনের দিন সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০জনে। রাতের অন্ধকারে ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠি চালানো এবং ছাত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে এক নজির সৃষ্টিকারী ভূমিকার সাক্ষ্য রাখলেন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।□

১১ ডিসেম্বর গণ-অবস্থানের উদ্বোধনী সমাবেশ

উদ্বোধক সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ যে ৬ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ ১৪টি সংগঠন লাগাতার গণ-অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে এই আন্দোলনের মধ্যে একটি জঙ্গী মনোভাব আছে। তাঁর ছাত্রাবস্থায় দেখা শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করেন যে সরকারী কর্মচারীরা সবসময়ই লড়াকু হন। চিরকাল তারা তাদের অধিকার আদায় ও রক্ষার তাগিদে লড়াই করে থাকেন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন রাজ্যে আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস চলছে। কর্মচারীদের ওপর নানা ধরনের দমন-পীড়ন নীতি নামিয়ে আনা হয়েছিল। বহু কর্মচারীকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের কথা না ভেবে রাজ্যের গণ-আন্দোলনের কথা ভেবে, শ্রমিক কর্মচারীাদের কথা মাথায় রেখে তাঁরা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়ে গেলেও তাঁরা নিজেদের কথা না ভেবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কথা ভেবে তাঁদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এটাই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের ইতিহাস। এই শিক্ষাকেই পাথেয় করে আগামী দিনের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসীন হওয়ার পর রাজ্যের আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। গণ-আন্দোলন করতে গেলে বাধা, মানুষ তার ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখাতে পারবে না। শুরু হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভয় দেখানো। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ধর্মঘটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে জোর করে অফিসে আসতে বাধ্য করা হল। কিছু কর্মচারীর মনে ভয় দেখা গিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক, কারণ বিগত সরকারের ৩৪ বছরে সরকারী কর্মচারীর ধর্মঘটের অধিকার ছিল, মিছিল মিটিং-এর অধিকার ছিল, ছিল গণতান্ত্রিক পরিবেশ। রাতারাতি সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আজও গুণ্ডা দিয়ে, পুলিশ লাগিয়ে, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন দল গণ আন্দোলন যাতে গড়ে না ওঠে তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সামনে কোনো অত্যাচারী, দমনকারী সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না।

বর্তমানে ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া। কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করলেও রাজ্য সরকার এখনো ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করে উঠতে পারেনি। পরিবহন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ঠিকমত মাইনে পাচ্ছেন না। শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একই অবস্থা। তাই আন্দোলন ছাড়া বিকল্প পথ নেই। এদিকে বাজার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ২০১১ সালে জিনিসের দাম যেখানে ছিল তা আজ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বাজারের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রকৃত আয় অনেক কম হচ্ছে। যে মহার্ঘ ভাতা পেলে সরকারী কর্মচারীরা একটু রেহাই পেতেন সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের নাকি টাকা নেই। অথচ মেলা, খেলা, ভাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে টাকার অভাব বোঝা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের সাথে প্রমোদ তরীতে সুন্দরবন ভ্রমণ করছেন, জলসা হচ্ছে, তাতে টাকার অভাব হচ্ছে না। এদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথা বললেই শ্রমিক-কর্মচারী নেতৃত্বদের দূর দুরান্তে বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু শ্রমিক কর্মচারীর টাকাই নয়, গ্রামের গরীব মানুষ আজ রেগা প্রকল্পে কাজ করেও ঠিক মত টাকা পাচ্ছেন না। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এনরেগা প্রকল্পের টাকা কমিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে রাজ্য সরকার, যারা কাজ করেছে তাদের টাকাও দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যেও যখন বাম শাসিত রাজ্য ত্রিপুরা রেগা প্রকল্পের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পাচ্ছে, তখন আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমিক তালিকায় পেছনের সারিতে অবস্থান করছে। বামপন্থীদের মূল দাবিই হচ্ছে গরীব মানুষের সমস্ত সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়েই গরীব মানুষের কিঞ্চিত সুবিধা হবে, বেকার সমস্যা কিছুটা মিটবে।

রাজ্য সরকার আজ গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থ একেবারেই দেখছে না। রাজ্যের চটকলগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে পথে বসার অবস্থায়। চা-শিল্পের আজ কঠিন পরিস্থিতি। চা শ্রমিকরা অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। রাজ্যের কৃষকদের আজ সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতি। সারের ওপর ভর্তুকি তুলে নেওয়া হচ্ছে। বীজের দাম আকাশ ছোঁয়া, অথচ কৃষক তার ফসলের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না।

তাই আজ কৃষক পথে নেমেছে, সরকারী কর্মচারী, কল-কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক, পৌর কর্মচারী, পরিবহন কর্মীরা সবাই আজ আন্দোলনে নামছে। লড়াকু মানুষের ঐক্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ আজ নতুন সূর্যোদয়ের আশা দেখছেন। মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। যে মানুষ ২০১১ সালে ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেছে, তারা আজ বুঝতে পারছে শ্রমিকের লাল ঝাণ্ডা আজও আছে। লড়াকু মনোভাব নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা সেই লাল ঝান্ডা বহন করে নিয়ে চলেছে। অতীতেও শ্রমিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনকে অনেক ওপরে নিয়ে গেছে। আগামীদিনে সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ তা সামনে নিয়ে আসতে হবে। সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। সাড়ে তিন বছরের সরকার আজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। সারদা কেলেংকারীতে জড়িত থাকার সন্দেহে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, আরো অনেককে জেলে যেতে হয়েছে। এটা সমগ্র দেশের কাছে রাজ্যের লজ্জা। সরকারকে আজ জবাব দিতে হবে। কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও তার কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে যখন বামপন্থীরা পথে নামছে, তখন রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে তা প্রতিহত করে কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থাভাজন হতে চাইছে, চাইছে সি বি আই তদন্ত থেকে অব্যাহতি পেতে।

গণঅবস্থান মঞ্চে সূর্যকান্ত মিশ্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

দেশে নতুন সাম্প্রদায়িক সরকারের উত্থানের পর গত ছয় মাসে সাড়ে সাতশ'র ওপর দাঙ্গা হয়েছে। ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুঁজিপতিদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসার পর এরা পুঁজিপতিদের স্বার্থই দেখছে। গরীব মানুষের কথা এরা ভাবছে না। পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের ওপর আসছে ভয়ঙ্কর আঘাত। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেলে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেনশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। সংগ্রামের ময়দানে দাঁড়িয়ে কে হিন্দু, কে মুসলমান তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, কে কোন্ জাতি তার কোন মূল্য থাকে না। ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

এর পর আয়োজক পনেরোটি সংগঠনের ওয়ার্কিং টিমের আহ্বায়ক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও রূপরেখা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, এই কর্মসূচীতে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সহ ফেডারেশন এবং সংগঠনকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী, এমনকি পেনশনাররাও আজ ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারী সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই না করে, তাহলে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে অথবা আক্রমণের ক্ষেত্রে এই সরকারকে টলানো কঠিন। তিনি ওয়ার্কিং টিমের পক্ষ থেকে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৪ নভেম্বর মৌলালী যুব কেন্দ্রের ১৫টি সংগঠনের কনভেনশন থেকে এই কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ৬ দফা দাবির মধ্যে যেমন আছে ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার দাবি, আছে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি। এছাড়া শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল সহ প্রশাসনিক দমন-পীড়ন বন্ধের দাবি। শুন্যপদে নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করণের দাবি, নতুন পেনশন স্কীম বাতিল সহ মৃত পোষ্যের চাকরির দাবিও রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাবি। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসীন হওয়ার পর কর্মচারীদের ওপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ভয়-ভীতির পরিবেশ। স্বভাবতই ধর্মঘট ডাকার পর যখন সরকারী চাকরী ছেদ বা মাইনে কাটার ভয় দেখানো হয়েছে তখন ৩৪ বছরের গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভ্যস্থতায় থাকা শ্রমিক কর্মচারীরা এগিয়ে আসতে ভয় পেয়েছেন। তবে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেননি। হাজার হাজার শ্রমিক তা উপেক্ষা করে ধর্মঘট করেছেন। আজ আবার সেই পরিস্থিতি এসেছে। সর্বক্ষেত্রে আজ শ্রমিক কর্মচারী আক্রান্ত। তাই এই ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ আমাদের দৃঢ় সংকল্প, এই ১৫টি সংগঠন লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না দাবি আদায় হচ্ছে। একদিকে সরকার বলছে কোষাগারে টাকা নেই, অন্যদিকে তার ব্যয়ের বহর দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার ছাড়া যাতায়াত করেন না, যেখানে সেখানে রঙের প্রলেপ লাগানো হচ্ছে, যখন তখন মন্ত্রীদের ঘর দুর্মূল্য আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছে, কোটি টাকা খরচা করে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে মহাকরণকে সরিয়ে গঙ্গার ওপারে নবান্নে নিয়ে গিয়ে তোলা হল। জনগণের টাকাকে যথেচ্ছ ভাবে অপচয় করা হচ্ছে। ক্লাব, উৎসব ইত্যাদি ক্ষেত্রে অঢেল টাকা বিলানো হচ্ছে। অথচ কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব, তা কিছুই প্রতিপালন করা হচ্ছে না। বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এই রাজ্যের কর্মচারীরা দেশের মধ্যে সবচাইতে কম মাইনে পান। সরকারে আসীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই মিথ্যাটিকে সত্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পরিস্থিতি ও কর্মসূচীর কথা জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব আছে এমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে দেওয়া হয়েছে। তিনি আশা করেন যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিধানসভায় এই বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে আনবেন। এছাড়াও প্রতিটি সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে এই অবস্থান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে পত্র দেবেন। পরিশেষে তিনি প্রত্যেকটি সংগঠনের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই কর্মসূচীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অশোক ঘোষ বলেন, যেকোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মানুষের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারীদের এই আন্দোলন মঞ্চ থেকে শুরু হোক আগামী পরিবর্তনের শুভ সূচনা। ইতিহাস তৈরি করে শ্রমজীবী মানুষ। আজ সেই ইতিহাসের ঘন্টা বেজে উঠেছে।

১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত এই ৬ দফা দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন যে রাজ্যে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকার ব্যর্থ। এদিকে রাজ্য সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ। তাই রাজ্যে আবার পরিবর্তন আনতে হবে। জনস্বার্থবাহী সরকারকে আবার আসীন করতে হবে, যারা গরীব মানুষের কথা ভাববে, যারা শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষা করবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনে ১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠন পাশে থাকবে। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে রঞ্জিত গুহ, এ আই ইউ টি ইউ সির পক্ষে বিমল জানা, কলকাতা ডিভিশন জীবন বীমা কর্মচারী সমিতির পক্ষে চঞ্চল ভট্টাচার্য।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক উৎপল রায়।□

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

গণ অবস্থানকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

শ্রেণী রাজনীতির অন্যতম সাথী তার শ্রেণী সংস্কৃতি। উভয়ের মেলবন্ধন, হাতধরাধরি করে দীর্ঘ পথ চলা, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার অন্যতম রাস্তা। তাই শ্রেণী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার তার শ্রেণী সংস্কৃতি প্রবল ঠান্ডাকে অতিক্রম করে সন্ত্রাসের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে ৬ দফা দাবীকে কেন্দ্র করে যে গণ অবস্থানের কর্মসূচী ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবস্থানে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল।

১১ ডিসেম্বর কর্মসূচীর সূচনা হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা পরিবেশিত গণসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। ১২ ডিসেম্বর সকাল থেকে ১৫ ডিসেম্বর সমাবেশ শুরুর আগে পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মী অনুগামীগণ গান, আবৃত্তি, হরবোলা সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। শতাধিক অংশগ্রহণকারীদের সকলের কর্মসূচীর কথা এই পরিসরে বলা অসম্ভব। প্রত্যেকের অনুষ্ঠানই উপস্থিত সকলের মন ছুঁইয়ে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৩ ডিসেম্বর বিকেলে পেনশনার্স সমিতির সংগঠন শ্যামাচাঁদ মণিগ্রামের গণযাদু পরিবেশন, ঐদিন সন্ধ্যায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

কর্মী ও পরিবার পরিজন দ্বারা অনুষ্ঠিত নাটক 'দাবা খেলা', ১৪ ডিসেম্বর, পেনশনার্স সমিতির পক্ষে গৌড়সুন্দর গায়েনের লোকসঙ্গীত, ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের পক্ষে বিধান মজুমদার পরিবেশিত গণসঙ্গীত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পার্শ্বশিক্ষক অমল দাসের হরবোলা।

এছাড়াও অনেক কমরেডের প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান এখানে উল্লেখ করা গেল না। রাতভর অবস্থানকারী নেতৃত্ব-কর্মীগণ স্লোগান শাউটিং সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে অংশ নেন। বমিলিয়ে লাগাতার গণঅবস্থান কর্মসূচীর জঙ্গী মেজাজের সাথে উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচীগুলিও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।□

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

১৫ ডিসেম্বর গণ-অবস্থানের প্রকাশ্য সমাবেশ

অবস্থান কর্মসূচীর পঞ্চমদিনে ১৫ ডিসেম্বর, বিকেল ৫:৩০ মিনিটে বিশাল শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকাশ্য সমাবেশ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন অশোক পাত্র, অভিজিৎ মুখার্জী, বাদল কর ও রামপ্রসাদ সেনগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সমাবেশের প্রারম্ভে উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন এ বি টি এ নেতা উৎপল রায়, কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা সুবীর বসু, জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ এর নেতা অঞ্জন ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের নেতা দীপক রায়চৌধুরী, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা রতন ভট্টাচার্য, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশনের নেতা বিজলী মিত্র, কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িক ইউনিয়নের নেতা অরুণাভ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা নির্ভীক মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতা মৃণাল দাস, সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এম প্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা জীবন সাহা, কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা গৌতম মজুমদার, এ বি পি টি এ নেতা সমর চক্রবর্তী এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। উদ্যোক্তা সংগঠনের নেতৃত্ব তাদের বক্তব্যে বলেন বর্তমান রাজ্য সরকারের সাড়ে তিনবছরের শাসন কালে সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সব স্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ভয়ঙ্কর আর্থিক বঞ্চনার সম্মুখীন। বকেয়া মহার্ঘভাতা বাড়তে বাড়তে আজ ৪৯ শতাংশ হয়েছে। এর সঙ্গে বেড়েছে পরিবহনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেতন ছাঁটাই, প্রশাসনিক আক্রমণ ও রাজনৈতিকআক্রমণ চলছে শিক্ষাক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে আগামীদিনে আরও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ তাঁর বক্তব্যে বলেন ১১ ডিসেম্বর থেকে গণঅবস্থান চলছে। সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত ১৫টি সংগঠনের ওয়ার্কিং টিমের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি পর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। ১৪ নভেম্বর মৌলালী যুবকেন্দ্রে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং কনভেনশনের সিদ্ধান্তক্রমে লাগাতার গণঅবস্থানের কর্মসূচী চলছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে ছয়শতাধিক অবস্থানকারী প্রতিরাত্রে অবস্থানে সামিল হয়েছেন। সকাল ৮ টা থেকে রাত্রি ৮টা এই অবস্থানকারীর সংখ্যা ছিল আরও বেশী। আর আজকের জমায়েত ঐতিহাসিক জমায়েত, জমায়েতের শেষ প্রান্ত রানী রাসমণি রোড ছাপিয়ে গেছে। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে সংহতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-ব্যাঙ্ক-বীমা কর্মীরা মিছিল করে এসেছেন। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি উদ্যোক্তা সংগঠনের পক্ষ থেকে গণঅবস্থানের দ্বিতীয় দিন ১২ ডিসেম্বর আলাদা আলাদা ভাবে বঞ্চনা ও আক্রমণ-এর বিষয় জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-শ্রমিক এককথায় কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীর বঞ্চনার কথা জানানোর জন্য জনসাধারণের কাছে যাওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা কলকাতা, হাওড়া, হুগলী এই পাঁচটি জেলায় প্রায় ২৫ টি জনসভা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে স্কোয়াড, পোস্টারিং মিছিল হয়েছে একে কেন্দ্র করে। এই ধরনের গণসংগ্রামের কর্মসূচী এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচী। ১৫টি সংগঠন নিয়ে এক নতুন অধ্যায় তৈরি হল। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার এতটাই অমানবিক যে যারা সরকারের হয়ে কাজ করেন সেই সরকারী কর্মচারী শিক্ষক শ্রমিকরা রাজপথে বিনিদ্র রাত জাগছেন আর প্রশাসন উদাসীন। যদি প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, কেন্দ্রীয় হারে ডি এ-র দাবি, পে-কমিশনের দাবি না মানা হয় তবে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে যেতে হবে এবং লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

গণঅবস্থানে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক প্রতিনিধিদের একাংশ

সমাবেশের মূল বক্তা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই দিনরাত্রীব্যাপী অবস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনগুলিকে অভিনন্দন জানান। বর্তমান সরকারের সাথে তিনবছরের শাসনকালে শ্রমজীবী মানুষের ওপর একের পর এক যে আক্রমণ নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে বেসরকারী পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা বিশেষত ট্যাক্সি পরিবহনের শ্রমিকরা পথে নেমেছেন — ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন, চাবাগানের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করছেন — ধর্মঘটে সামিল হচ্ছেন, কৃষকসভার পক্ষ থেকে সারা রাজ্যব্যাপী কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে অর্থাৎ সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ পথে নেমেছেন আন্দোলন সংগঠিত করছেন। অপেক্ষায় ছিলাম শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীরা কবে পথে নামবেন। এই লাগাতার গণঅবস্থানের কর্মসূচী প্রমাণ করে দিল তারা পথেই আছেন। আর জমায়েতের যে ইতিহাস আজ তৈরি হল তা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাবি, বেতন কমিশন গঠনের দাবি, চুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ ছয় দফা দাবিতে এই শীতের মধ্যে আপনারা অবস্থান করছেন তার সবকটি দাবিই ন্যায্য দাবি। কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি কিংবা মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দূরের কথা রাজ্যে বর্তমানে কোনো সরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমরা চাই এই সরকার তার শাসনকাল পূর্ণ করুক। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে শ্রমিক-কর্মচারীদের তাদের দাবি অর্জনের জন্য এভাবে পথে নামতে হয়নি। আমাদের অর্থমন্ত্রীরা আলোচনা করছেন কতটা পারবেন তা আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। মহার্ঘভাতা বকেয়া ছিল না এমন নয় কিন্তু তা কখনই এখনকার মত নয় তবু সে সময় অল্প কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মহাকরণের ভিতরেই মিছিল করে শ্লোগান দেওয়া হত— সরকারের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও। সংখ্যায় তারা অল্প হলেও কখনই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের আটকানো বা কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়নি বা প্রতিহিংসামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের সর্বশেষ ভোট অন অ্যাকাউন্টেও বকেয়া ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতার মধ্যে ১০ শতাংশ ধরা ছিল যা এই সরকার ৭ মাস বাদে ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দিয়েছিল। বর্তমান মহার্ধভাতা বকেয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সরকার নজির সৃষ্টি করেছেন যা ভারতবর্ষে অন্য কোনো রাজ্যে নেই। একই সঙ্গে রয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। মানুষের কথা বলার ওপর

রমেন পান্ডে

আক্রমণের ঘটনা — রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আরও বড় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যে পনেরোটি সংগঠন যৌথভাবে আজ পথে নেমেছেন তারা ৮০ ভাগ কর্মচারীর প্রতিনিধিত্ব করেন। কাজেই যে ভাষায় কথা বললে এই সরকারের কর্ণগোচর হবে প্রয়োজনে সেই ভাষায় কথা বলতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীর লড়াই আন্দোলনের যত হাতিয়ার আছে তার শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট, এ সরকার অন্য কোনো ভাষা না বুঝলে প্রয়োজনে ধর্মঘটে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-ব্যাঙ্ক-বীমা ক্ষেত্রের কর্মচারীরা ১২ই জুলাই কমিটির পতাকাতলে এই অবস্থান কর্মসূচীকে সংহতি জানাচ্ছে। দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে দেশের সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে, ব্যাঙ্ক-বীমা-রেল-প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, ডান-বাম ঝান্ডা নির্বিশেষে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংসদ অভিযান হচ্ছে, সংসদে কেন্দ্রীয় ফেডারেশনগুলি এতে যুক্ত হচ্ছে। সমগ্র কর্মচারী সমাজকে এই আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিপদ দেশের মেহনতী মানুষের ঐক্য আক্রান্ত — ধর্মনিরপেক্ষতা আক্রান্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে। একটি রাজ্যের রাজ্যপাল বলছেন রামমন্দির করতে হবে, বিদেশমন্ত্রী থেকে বিভিন্নমন্ত্রী নির্বাচিত সাংসদরা দেশের সংবিধানকে লঘু করে বক্তব্য পেশ করছেন। নির্বাচনের আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলেছিলেন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবেন, আর ক্ষমতায় এসে তিনি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার বদলে ডিজেলের বিনিয়ন্ত্রণ করলেন, কালো টাকা ফেরানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তার বদলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত বিদেশভ্রমণে, দেশের সম্পদ দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে। এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক-বীমা-রেলের কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কলকাতায় সমাবেশে এসে বলছেন আমরা পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমিয়েছি। যেখানে দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে এ দাবি মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যেখানে দাম কমার কথা ১৫-২০ টাকা প্রতি লিটার সেখানে দাম কমেছে ৫-৬ টাকা। তাহলে প্রশ্ন এটাই যে বাকি টাকা যাচ্ছে কোথায়? রাজ্যের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতি চলছে। দেখে মনে হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার যেন বিরোধীপক্ষ। সরকারের দায়িত্ব পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখা, তার বদলে মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর দল রাস্তায় নেমে সি বি আই বিরোধীতার নামে পরিবহন আটকাচ্ছেন, কারণ পরিবহন মন্ত্রী সি বি আই এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সরকার চালাচ্ছেন, তাতে সরকার কত দিন চলবে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন সরকারী কর্মীদের ডি এ থেকে শুরু করে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে গ্রামের গরিবদের বকেয়া মজুরি, সব আটকে রয়েছে এই সরকারের হাতে। বিধানসভায় জনবিরোধী আইন পাস হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন থাকবে কি না, তা নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রের ডাকে গুত্বপূর্ণ বৈঠক হচ্ছে,অথচ কোথাও মুখ্যমন্ত্রী হাজির নেই। তিনি সুন্দরবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, লঞ্চের ওপরে জলসা করছেন। বেশ করছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর একেকটা সফরে, মেলা-উৎসবে সরকারের কত খরচ হচ্ছে, তার কোনো জবাব নেই। সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন আমরা বিরোধী দল, কিন্তু মানুষ সমস্যার কথা বলতে বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে আসছেন। আমরাও তাই বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছি, অহেতুক বিলম্ব না করে সি বি আই তদন্ত দ্রুত করুন। মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করুন, জেরায় সন্তোষ জনক জবাব না পেলে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করুন।

বিরোধী দলনেতা আরো বলেন সরকারী কর্মচারীদের রুটি রুজি শুধু নয় আক্রান্ত আজ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। প্যারাটিচাররা পথে নামছেন, এই সরকারের সময়ে নিয়োজিত সিভিক পুলিশ-গ্রীন পুলিশ যাদের এখন স্বেচ্ছাসেবক বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে তারাও নিয়মিত বেতন না পেয়ে পথে নামছেন। সকলকে যুক্ত করে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হতে হবে। ৩৪ বছরে কখনও যা ঘটেনি একজন মন্ত্রী গ্রেফতার হচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে সরকারে রেখে দিচ্ছেন। থানার ভিতরে পুলিশ নিজেই আক্রান্ত হচ্ছে। আলিপুর আদালতও দেখিয়ে দিয়েছে, আদালতও আক্রান্ত। তাহলে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা পাবে কি করে?

রাম রহিমের নামে রাজ্যকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে, জীবনজীবিকা রক্ষার সংগ্রামে, নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামীর সংগ্রামের জন্য সকলে প্রস্তুতি নিন। শ্রমিকশ্রেণীর সর্ববৃহৎ হাতিয়ার ধর্মঘট তাতে শান দিন, এ লড়াইতে আমরা আপনাদের সাথে থাকব বিধানসভার ভেতরে সংখ্যায় অল্প হলেও থাকব। বিধানসভার বাইরে সর্বশক্তি নিয়ে পাশে থাকবো। সর্বশেষে তিনি এই গণ অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান এবং তাদের দাবিকে সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন।

বিরোধী দলনেতার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ আগামীতে আরও উচ্চতর ও কঠিন সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে এই অবস্থান কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী বৃহত্তর কর্মসূচীতে সকলকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।□

দেবাশীষ রায়

১১ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় সমাবেশ

বীরভূম

১১ ডিসেম্বর ২০১৪ বীরভূম জেলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোর্ড-কর্পোরেশন বিধিবদ্ধ সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ৬ দফা দাবিতে যৌথ আন্দোলনের সমাবেশ সিউড়ীর জেলা শাসক অফিস সংলগ্ন শহীদ বেদীতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে জেলার বিভিন্ন ব্লক, সেক্টর, মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে মহিলাসহ সহস্রাধিক কর্মচারী ময়ূরাক্ষী ইরিগেশন অফিস প্রাঙ্গন থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে দাবি সম্বলিত পোস্টার, ফেস্টুন সহ শহর পরিক্রমার পর সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হয়। কমল দত্ত, সমর ব্যানার্জী, আনোয়ার হোসেন, অরুণ ওঝাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক পরিমল কর্মকার ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেন।

সভায় ১২ ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক জওহর লাল জানা সহ এ বি টি এ, এ বি পি টি এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন এবং উদ্যোক্তা সংগঠন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বক্তব্য পেশ করেন।

কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও লড়াকু মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।□

নদীয়া

১১-১৫ ডিসেম্বর, '১৪ কেন্দ্রীয় গণ অবস্থান কর্মসূচীর সমর্থনে নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর সদরে পাত্রবাজার ট্রাফিক মোড়ে ১১ ডিসেম্বর বিক্ষোভ জমায়েত কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকাল ৫-৩০টার সময়। প্রায় ৩০০ এর মতো রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ এ বি টি এ, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন, পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও অনুগামীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি প্রদীপ বিশ্বাস ও এ বি টি এ-এর পক্ষে স্বপন বাগচীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

বক্তব্য রাখেন শঙ্কর ব্যানার্জী (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), পবিত্র ভট্টাচার্য (কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউ.) মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সংগঠন), শুক্লা সাহা (এ বি টি এ) ও সুধন্য সরকার (১২ই

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

জাতীয় প্রতিবাদ দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আনছে, তত বেশি মানুষ আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। চা শ্রমিকদের আন্দোলন তার অন্যতম উদাহরণ। চটকল স্তব্ধ হয়েছিল শ্রমিকদের আন্দোলনে। ব্যাঙ্ক-কর্মচারীরাও পরিষেবা স্তব্ধ করেছেন। কয়লা শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যাচ্ছেন। এসবের মধ্য দিয়ে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন সরকারকে যে বিলগ্নীকরণের সংস্কৃতি চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার হরণ করতে চাইছে। শ্রমিকদের ক্রীতদাস করতে চাইছে। একদিকে দিল্লীতে মোদী সরকার, অন্যদিকে কলকাতায় মমতা সরকার দুজনেরই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বৃহৎ শিল্পপতিরা নন, শ্রমিকশ্রেণী। তাই শ্রমিক-কর্মচারীরা রাস্তায় নেমেছেন আন্দোলন সংগ্রামে। রেলের কর্মচারীদের কাছে আমাদের আহ্বান আপনারাও এগিয়ে আসুন।

আই এন টি ইউ সি-র রমেন পাণ্ডে বলেন, শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের উপর শাসকশ্রেণী আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনিও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে সমীর ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ হচ্ছে তার মোকাবিলার তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন আন্দোলন সংগ্রামে। একদিকে গরিব মানুষের যাবতীয় ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে আদানি, আম্বানিদের জন্য ৫ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকির ব্যবস্থা করছে এই সরকার। প্রচার করা হচ্ছে গরিব মানুষের এই ভরতুকি নাকি দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে। এরাজ্যের সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দিচ্ছে না বাজার অগ্নিমূল্য হলেও।

এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি-র রণজিৎ গুহ, ইউ টি ইউ সি-র বরুণ চৌধুরী, টি ইউ সি সি-র নরেন চ্যাটার্জি, এইচ এম এস-র সমীর রায়, বি এম এস-র শক্তি পাঠক, এ আই ইউ টি ইউ সি-র দিলীপ ভট্টাচার্য, এ আই সি সি টি ইউ-র বাসুদেব বসু প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এদিনের সভা থেকে আগামী ১৯ ডিসেম্বর ট্যাক্সি ধর্মঘটের সমর্থনে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়।

দিল্লিতে

জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীতে শ্রমিক ঐক্যের জোরালো মেজাজ দেখা গেল দিল্লির বুকে, শুক্রবার সংসদের পাশেই যন্তরমন্তরে ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা যৌথ প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হলো, শুধু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সরকার শ্রমিকবিরোধী পদক্ষেপ কার্যকর করতে পারবে না। রাস্তায় মাঠে ময়দানে নেমে শ্রমিকরা তা প্রতিরোধ করবে। প্রয়োজনে দেশজুড়ে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হবে।

মোদী সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শুক্রবার যৌথভাবে জাতীয় দিবস পালন করেছে সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। সব রাজ্যের রাজধানীতে প্রতিবাদ দিবস পালন করতে বিক্ষোভ সভা করার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে যন্তরমন্তর রোডেও বিক্ষোভ সভা হয়েছে। সকাল এগারোটা থেকে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে শ্রমিক কর্মচারীরা দলে দলে মিছিল করে আসতে থাকেন যন্তরমন্তরে। রেল, ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মচারীরাও এসেছিলেন। লালটুপি মাথায় লাল পতাকা নিয়ে লম্বা লম্বা মিছিল আসে। সেইসঙ্গে আই এন টি ইউ সি-র তেরঙ্গা এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের পতাকা নিয়েও মিছিল এসে যন্তরমন্তর রোডে বিশাল জমায়েতের আকার নেয়। এমনকি বি জে পি অনুগামী বি এম এস-ও এই কর্মসূচীতে সামিল হয়েছিল। সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির প্রতিবাদে তাদেরও ফেস্টুন দেখা গেছে সমাবেশে। 'মজদুর একতা জিন্দাবাদ' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। নানা ট্রেড ইউনিয়নের নানা পতাকা নিয়ে একসঙ্গে এমন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সমাবেশ দেখে উৎসাহিত হয়েছেন মঞ্চে আসীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দও। তাঁরা ঘোষণা করেছেন, গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকের সমাবেশ করা হলো। এটা লড়াইয়ের শুরু। সরকারের কানে এই আওয়াজ না ঢুকলে আমরা আরো বড় আন্দোলনে যাবো। সব ট্রেড ইউনিয়ন মিলিতভাবেই আবার বৈঠকে বসে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ চূড়ান্ত করবো। প্রয়োজনে আমরা দেশজুড়ে ধর্মঘটের পথে হাঁটবো।

সুপ্রিম কোর্ট কয়লার ব্লক বন্টন বাতিল করা মাত্র নতুন করে অর্ডিন্যান্স করে বেসরকারী সংস্থাকে কয়লা ব্লক বন্টনের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সঙ্গে গত ২৪ নভেম্বর থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্র শ্রমআইনের বাধ্যবাধকতা থেকে বহু শিল্প সংস্থাকে ছাড় দেওয়ার বিল, অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট-এর সংশোধনী বিল ইত্যাদি করিয়ে নিয়েছে। বীমাক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের সিলিং বাড়ানোর মতো বিলগুলিও এই অধিবেশনে পাশ করাতে পারে সরকার। এই কারণে এদিনের প্রতিবাদ সভায় সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, সংসদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠাতার জেরে সরকার বিল পাস করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু কার্যকর করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে শ্রমিকদের প্রতিরোধের ওপরে। প্রতিবাদকে প্রতিরোধের স্তরে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। বেসরকারীকরণ ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রতিবাদে বি এস এন এল কর্মীরা আন্দোলন করছেন, ব্যাঙ্ককর্মীরা ধর্মঘটে নেমেছেন, বীমা, রেল, কয়লা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কর্মীরাও তীব্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এভাবে যদি সব শিল্পক্ষেত্রে প্রতিরোধের সংগ্রাম হয়, তাহলে সরকার কিছুতেই শ্রমিকবিরোধী নীতি কার্যকর করতে পারবে না।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের জন্য যেটুকু আইনি সুরক্ষা ছিল, এই সরকার সেটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে শ্রম আইন পাল্টে ৮০ শতাংশ শ্রমিককে শ্রমআইনের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দাসত্বের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে শ্রমিকদের। অধিকার নিয়ে যাতে কোন দাবি শ্রমিকরা করতে না পারে তারজন্য আগে আইনী অধিকারগুলোই তুলে দেওয়া হচ্ছে। সরকারকে যারা ভোট দিয়েছে তাদের স্বার্থে না চলে, নির্বাচনের আগে যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের স্বার্থে চলছে।

এ আই টি ইউ সি নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন, জনতার হিতে নয়, পুঁজিপতিদের হিতে সরকার কাজ করছে। পুঁজিপতিদের জুলুমের রাজত্ব তৈরি করছে। আমরা সব ট্রেড ইউনিয়ন একসঙ্গে লড়াই করছি কোনো সরকার বদলের জন্য নয়, সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতি বদল করানোর জন্য।

কলকাতায় জমায়েতের একাংশ

সমাবেশে বি এম এস নেতা ব্রিজেশ উপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক-বিরোধী নীতি কার্যকর করছে বলে অভিযোগ করে বলেছেন, এর বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা সব ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে রয়েছি। আই এন টি ইউ সি নেতা অশোক সিং বলেন, পুঁজি থেকে ঘাম তৈরি হয় না, শ্রমিকের ঘাম থেকে পুঁজি তৈরি হয়, তা সত্ত্বেও সরকার শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে কেবল পুঁজিপতিদের কথা মতো শ্রম আইন পাল্টে দিলো। এভাবে সরকার দেশের শিল্পের মঙ্গল করতে পারবে!

এইচ এম এস নেতা হরভজন সিং বলেন, মারুতি কারখানায় বারো ঘন্টা কাজ করাচ্ছে, অথচ শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দিচ্ছে না। ইউনিয়ন করতে চাওয়ার জন্য তাদের ওপর লাঠি গুলি চালিয়েছে, এখনো ১৪৭ জন শ্রমিককে জেলে আটকে রেখেছে। এই সরকার শ্রমিকদের বেঁধে রেখে বিদেশী পুঁজিকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে। কিন্তু শ্রমিকরা প্রতিবাদে নামলে সরকার পারবে না। আগের সরকার এই চেষ্টা করে সাফ হয়ে গেছে, এই সরকারও সেই পথে চললে সাফ হয়ে যাবে।

ঠিকা শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি, মূল্যবৃদ্ধিরোধ ইত্যাদি দাবির কথাও বলেছেন নেতৃবৃন্দ। নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন সরকারে এসে তার উলটো পথে চলেছেন বলে অভিযোগ করে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ভারতীয় শ্রমিক বিদেশী পুঁজির গোলামি করবে না বলে সরকারে এসে এখন সবকিছু বিদেশীদের হাতে তুলে দিলে শ্রমিকরা তার প্রতিবাদ করবেই। সমাবেশে এছাড়াও ভাষণ দেন ইউ টি ইউ সি নেতা অবনী রায়, টি ইউ সি সি নেতা দেবরাজন, এ আই সি সি টি ইউ নেতা রাজীব চৌধুরী, এ আই ইউ টি ইউ সি নেতা সত্যবান, এম ই সি নেতা প্রকাশ রাও, এন এফ আই আর নেতা এম রঘুবাইয়া, সেবা ইউনিয়নের মানালি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।□

জেলায় সমাবেশ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

জুলাই কমিটি)। সভাকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।□

উত্তর দিনাজপুর

১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ জেলা যৌথমঞ্চের সাতটি সংগঠনের উদ্যোগে রায়গঞ্জ সদরে উত্তর দিনাজপুর জেলার সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করেই শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। দেড়শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী (১৫ জন মহিলাসহ) অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রায় ১০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনগুলির প্রতিনিধি নেতৃত্ব ছাড়াও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়।□

জলপাইগুড়ি

রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ১৫টি সংগঠনকে নিয়ে ৪৯ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ ছয়দফা দাবীতে ১১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতার 'ওয়াই চ্যানেলে' লাগাতার অবস্থানের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে গণ-অবস্থানের শুরুর দিন ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ জেলা কর্মচারী ভবনে সন্ধ্যা ৬টায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। উক্ত সমাবেশে জেলার মোট ৮টি সংগঠনের ২৫০ জনেরও বেশী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমল ভট্টাচার্য, দিলীপ বণিক, সত্যেন বোস, সুবীর পালিত, অরুণ পণ্ডিত ও স্বপ্না দেবকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। ছয়দফা দাবী প্রস্তাব পেশ করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কৌস্তভ রায়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এ বি পি টি এ-র পক্ষে বিপ্লব ঝা, প:ব: কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে জীবেশ দত্ত বিশ্বাস, নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর পক্ষে অসিত বাগচী, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশনের পক্ষে সন্দীপ ব্যানার্জী, এ বি টি এ-র পক্ষে অরুণ সরকার, প:ব: প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে প্রণব সোম ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে বাণীব্রত সাহা। সমাবেশ থেকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ অফিস ছুটির পর উদ্দীপ্ত যৌথ মিছিল জেলা শহর পরিক্রমা করে।□

পুরুলিয়া

বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ষষ্ঠবেতন কমিশন / কমিটি গঠন বদলিসহ রাজ্য প্রসাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্বশাসিত বোর্ড করপোরেশনগুলিতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ, চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণের দাবী সহ ছয়দফা দাবীতে এরা রাজ্য সর্বস্তরে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারপ্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে রাজ্য কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ১৫টি সংগঠন আহুত কলকাতার কেন্দ্রীয় গণঅবস্থানের কর্মসূচীর পরিপূরক কর্মসূচী হিসাবে জমায়েতের কর্মসূচী আমাদের জেলা সদরে অফিস ছুটির পর জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে সদরের কর্মচারী ও শিক্ষকদের ব্যাপক জমায়েতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় গত ১১/১২/২০১৪ তারিখে। প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারী শিক্ষকদের উপস্থিতি ঘটে। এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি রঙ্গলাল মাহাত, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জয়ন্ত কুন্ডু, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে নিলয় মুখার্জী।

ছয় দফা দাবী নিয়ে প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য্য, বক্তব্য রাখেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে বিভূতি পরামানিক, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেনস ফেডারেশনের পক্ষে অমল মিশ্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির মধুসুদন ব্যানার্জী, সাউথ বেঙ্গল স্টেস ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শম্ভুনাথ মাহাত, পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সন্দীপ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের মাধব পান্ডে, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিশ্বনাথ মাহাত, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির সৌরভ ভৌমিক।

আন্দোলনের কর্মসূচীর সাফল্য কামনা এবং আগামী লড়াই আন্দোলনে আরো প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন রায়চৌধুরী। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে জেলার প্রতিটি ব্লকে এবং জেলা সদরে পাঁচটি অঞ্চলের অফিস দপ্তরগুলিতে টিফিনের সময় বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ১০/১২/২০১৪ জেলা সদরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে ছয়দফা দাবি নিয়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।□

পুরুলিয়া জেলা সদরে জমায়েতের একাংশ

মোদি সরকারের 'আচ্ছে দিনের' নমুনা

লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির স্লোগান ছিল 'আচ্ছে দিন আয়েগি'। সাত মাস আগে নির্বাচন হয়ে গেছে। বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। নরেন্দ্র মোদীও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সাত মাস খুব বেশী সময় না হলেও, সরকারের নীতির অভিমুখ ও অগ্রাধিকার বোঝার জন্য যথেষ্ট সময়। ফলে দেশবাসীর জন্য কেমন 'আচ্ছে দিন' উপহার তার দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, তার কয়েকদিন নমুনা নীচে উল্লেখ করা হল।

কৃষিতে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি

- কৃষিতে উৎপাদন ক্রমাম্বয়ে হ্রাস পাচ্ছেন। বিশেষ করে খাদ্য শস্যের উৎপাদন।
- শুধু প্রাকৃতিক কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে তা নয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, কৃষি থেকে কৃষকের আর ক্রমশ কমছে। কৃষি আর লাভজনক থাখছে না
- খরিফ চাষের মরশুমে উৎপাদন কমেছে ৭ শতাংশ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে ১ কোটি টন। ধানের উৎপাদন কমেছে ৩০ লক্ষ টন।
- রবি চাষের জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ কমেছে ৫ শতাংশ। গমের ক্ষেত্রে কর্ষিত জমির পরিমাণ কমেছে ৩ শতাংশ, ছোলা ১৫ শতাংশ, ডাল ৮ শতাংশ, তৈলবীজ ৬ শতাংশ।
- জাতীয় নমুনা সমীক্ষার কৃষক পরিবারের অবস্থা সংক্রান্ত সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি কৃষক পরিবারের ফসল থেকে যে আয় হয়, তার ৩০ শতাংশই চলে যাচ্ছে কৃষি উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহের জন্য।
- দেশের অর্ধেকের বেশী কৃষক পরিবারের ঋণ রয়েছে। ভারতের কৃষক পরিবারের গড় ঋণ ৪৭ হাজার টাকা।
- অন্ধ্রপ্রদেশে ৯২ শতাংশ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। তেলেঙ্গানায় এই হার ৮৯ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৮২ শতাংশ। কর্নাটক ও কেরালায় ৭৭ শতাংশ।

বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য

- কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান আর্থিক বর্ষে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩৬.৩ কোটি।
- ২০১১-১২ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছিল মোট জনসংখ্যার ২১.৯ শতাংশ দরিদ্র। বর্তমান বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দারিদ্র্য বেড়ে হয়েছে ২৯.৫ শতাংশ।
- শহরে দারিদ্র্য বৃদ্ধির হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। ২০১১-১২ সালের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ১৩.৭ শতাংশই ছিলেন দরিদ্র। মোট সংখ্যা ছিল ৫.৩ কোটি।
- ২০১৪ সালে সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬.৪ শতাংশ। মোট সংখ্যা ১০.৩ কোটি।
- সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রাম ও শহর মিলিয়ে জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ দরিদ্র।
- বিশ্ব ব্যাঙ্কে গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবীর নিদারুণ দরিদ্র মানুষের ৩০ শতাংশের বাস ভারতবর্ষে।□

জমি অধিগ্রহণ আইনে সংশোধনী অর্ডিন্যান্স

ইউ পি এ সরকারের শেষলগ্নে চালু হওয়া জমি অধিগ্রহণ আইনের বহু ধারা বাতিল করে সংশোধনী অর্ডিন্যান্স আনলো নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিগত ২৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করেছে। নতুন অর্ডিন্যান্সের ফলে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমিদাতার সম্মতি, গণশুনানি, সামাজিক প্রভাব সমীক্ষার আর কার্যত কোন প্রয়োজন হবে না। চালু আইনে বহুফসলী জমিকেও অবাধে অধিগ্রহণের রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। শীতকালীন অধিবেশন শেষ হবার অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই জমি অধিগ্রহণ ঘিরে দেশের নানা প্রান্তেই বিক্ষোভ-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকায় স্বাধীনতার পর থেকে চালু এ সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের দাবি ওঠে। অভিযোগ উঠছিল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে বিপুল পরিমাণ জমি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী ও কর্পোরেট ক্ষেত্রের হাতে। অনেক ক্ষেত্রেই জমি হারানোর যথাযথ ক্ষতিপূরণ, জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবিকার পুনর্বাসন ছাড়াই এই প্রক্রিয়া চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জমি অধিগ্রহণ আইনে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ইউ পি এ সরকারের আমলেই। এই আইনের খসড়া নিয়ে বারংবার আলোচনা হয় সরকারী স্তরে এবং সংসদীয় কমিটিতে। অবশেষে ২০১৩ সালে নতুন আইন অনুমোদন হয় এবং এবছরের জানুয়ারি মাসে ইউ পি এ সরকারের আমলেই তা চালু হয়।

এই আইনের গুরুতর পরিবর্তন করে নতুন অর্ডিন্যান্স করা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সে 'পাঁচটি ক্ষেত্রে' জমি অধিগ্রহণের সময় জমির মালিকদের সম্মতি নেবার ধারা তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো— জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ সহ গ্রামীণ পরিকাঠামো, শিল্প করিডর, সামাজিক পরিকাঠামো যেখানে জমি মালিকানা সরকারেরই থাকবে। এই পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে শুধু সরকারী উদ্যোগই নয়, সরকারী, বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ বা পি পি পি-ও থাকবে। যদিও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেছেন, ক্ষতিপূরণের কোনো পরিবর্তন করা হচ্ছে না। চালু আইনে ছিল, কোন জমি অধিগ্রহণের আগে সামাজিক প্রভাবের সমীক্ষা করতে হবে। অর্থমন্ত্রী তাও বাতিল করে দিয়েছেন 'উন্নয়নের কাজে ব্যাঘাত'-এর অজুহাতে।

আসলে অর্থনৈতিক সংস্কারের বেশ কিছু কর্মসূচিতে সংসদের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই একের পর এক অর্ডিন্যান্সের পথে যাচ্ছে মোদি সরকার। বীমায় বিদেশী বিনিয়োগের ঊর্দ্ধসীমা বাড়িয়ে দেওয়া, কয়লা ক্ষেত্রে কার্যত বেসরকারীকরণের লক্ষ্যেও উপর্যুপরি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। এরপর খনি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিকে আরো অনুপ্রবেশের সুযোগ দিতে অধ্যাদেশ জারির প্রস্তুতি চলছে। এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জেটলি বলেছেন, সরকারকে দৃঢ়তা নিয়েই সিদ্ধান্ত রূপায়ন করতে হবে। সংস্কারের পথে সংসদ বা রাজনৈতিক বাধা মান্য করা হবে না বলে আগেই জানিয়েছিলেন প্রদানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই বাস্তবায়িত হচ্ছে। □

লজ্জাজনক ভাবে 'পেছনের দরজা' দিয়ে বীমা ও কয়লা শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের প্রবেশ

নয়া উদারনীতির পথ প্রশস্ত করতে বিগত ইউ পি এ-২ সরকারের পথেই হাঁটল বর্তমান বিজেপি সরকার। শীতকালীন অধিবেশন বীমা এবং কয়লা বিল লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় পাশ করাতে না পারার ঝুঁকি নিল না নরেন্দ্র মোদী সরকার। সংসদীয় রাস্তা এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা হল। গত ২৪ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে একই দিনে কয়লা এবং বীমা ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দুটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এর স্বপক্ষে দাবি করেন যে বীমাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী ব্যবহার করাই নয়, তারা কয়লা উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিক্রি করতে পারবে বাজারে। এছাড়াও খাদানের পাশাপাশি জমির স্বত্বও সেই সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বীমা বিল নিয়ে বিতর্কের জেরে রাজ্যসভায় তা পাশ করানো যায়নি। রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটি বিলের মূল বয়ান পেশ করে। কিন্তু, বিল পাশ না হওয়ায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার ঠিক পরই তা করে দেখালো কেন্দ্রীয়

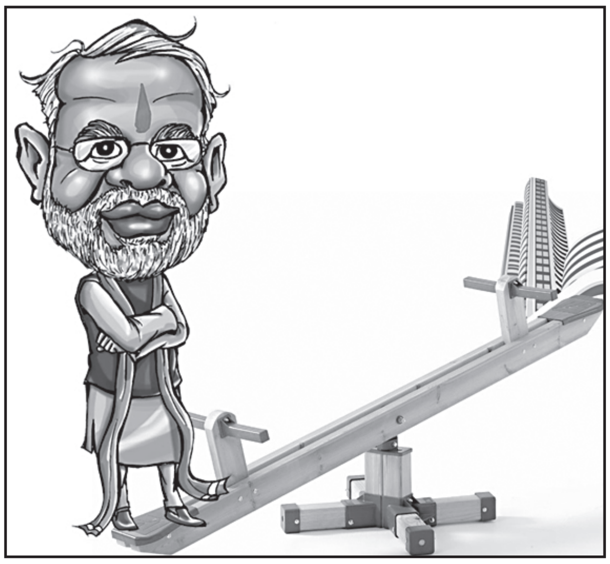

বিনিয়োগের সীমা ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি করায় ৬০০ থেকে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে। ২০০৮ সাল থেকে এই বিলটি সংসদে পড়ে ছিল। কয়লা খাদানের ক্ষেত্রে পূর্বেই অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল। এদিন তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল। আর্থিক সংস্কারের নামে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার অনন্য নজীর গড়ল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। ইউ পি এ সরকারের সময় এই বিল আলোচনায় থাকলেও বামপন্থীদের প্রবল চাপের কারণে তা কার্যকর করতে পারেনি। অতীতেও ২০০২ সালে, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় এন ডি এ সরকার কয়লাখনি বেসরকারী বিল সংসদে আনলেও পাশ করাতে অক্ষম হয়। অতি দ্রুত দেশের কয়লা ক্ষেত্রে বি-জাতীয়করণের লক্ষ্যে মোদী সরকার লোকসভায় গরিষ্ঠতাকে হাতিয়ার করে দেশী-বিদেশী বহুজাতিকদের ভারতের কয়লা খাদানে অবাধ লুঠের ব্যবস্থা করে দিল। বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে বেছে নেওয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শুধু খাদানের কয়লা নিজস্ব প্রয়োজনে মন্ত্রিসভা। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, সংস্কারের পক্ষে যে সরকার দৃঢ় তা প্রমাণ করতেই এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হল।

১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একযোগে কয়লার বিজাতীয়করণ ও বেসরকারীকরণ এবং বীমা শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের তীব্র বিরোধীতা করেছে। চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এই সিদ্ধান্তের ফলে জাতীয় স্বার্থকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে বি এম এস দপ্তরে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে এক বিবৃতি দিয়েছে। কয়লা শ্রমিকরা ৬ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পাঁচদিনের ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও ১৩ জানুয়ারি পূর্ব ঘোষিত ধর্মঘট পালিত হবে। আগামী ২ জানুয়ারি বৈঠকের জন্য কয়লামন্ত্রী আমন্ত্রণ খারিজ করে দেওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা ভারত কয়লা শ্রমিক ফেডারেশন। বীমাকর্মীরাও ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির ডাকে ২৯ ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন বিরতির সময় গোটা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। □

হিন্দু মৌলবাদীদের রোষের শিকার এই চলচ্চিত্রটি

জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ ছুটির আবেদনও বাতিল করল রাজ্য সরকার

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch
Nabanna, Howrah–711102

No. 5971-F(P) Date–27.11.14

From : Sri S. K. Ghosh,
Deputy Secretary to the
Government of West Bengal

To : The General Secretary
State Co-Ordination Committee
Of the West Bengal Govt. Employees'
Associations & Unions,
''Karmachari Bhaban''
10A, Sankharitola Street,
Kolkata–700 014

Sub. : Grant of Special Casual Leave for attending 15th National Conference.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. Co-ord/ 71/14, dt. 30.10.14 on the subject noted above and to say that after careful consideration of the matter, it has been decided not to grant Special Casual Leave as prayed for.

Yours faithfully,
S. K. Ghosh
Deputy Secretary to the
Government of West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গ আজ লকআউটে দেশের শীর্ষে

বর্তমান রাজ্য সরকার যখন বিভিন্ন সরকারী বিজ্ঞাপন ও প্রচার পুস্তিকায়, রাজ্যে শ্রম পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতির উল্লেখ এবং একটিও শ্রম দিবস নষ্ট হয়নি বলে দাবি করছেন তখন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ এখন লকআউটে দেশের মধ্যে শীর্ষে। শিল্পপতিদের নিয়ে 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' এর প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই তথ্য, রাজ্যের শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় সাংবাদিকদের জানালেন, গত তিন বছরে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কারখানা লকআউট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেই। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের বিভিন্ন সভায় হাল আমলে শিল্পোন্নতি হয়েছে বলে যতই দাবি করুন না কেন, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কারখানা লকআউটের রিপোর্টগুলোর তুলনা করলেই দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য আজ লকআউটের শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা চা শিল্পের। রাজ্যে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চা শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। চা শ্রমিকদের আজ ধর্মঘটে যেতে হচ্ছে। এই ভয়ানক পরিস্থিতির মোকাবিলার স্বার্থে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে আলোচনার জন্য দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

সম্মেলন কক্ষে এদিন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা থাকলেও, পরিস্থিতি আগাম আঁচ করতে পেরে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী আগেই সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। □

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির তথ্য

কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশেষ ১/৭/২০১৪ থেকে ১০ শতাংশ ঘোষণা করার পরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার সর্বমোট হার ১০৭ শতাংশ

রাজ্য	সর্বমোট মহার্ঘভাতার হার	বকেয়া
১। হরিয়ানা	১০০%	৭%
২। হিমাচল প্রদেশ	১০০%	৭%
৩। মণিপুর	৯০%	১৭%
৪। মেঘালয়	৮৯%	১৮%
৫। মিজোরাম	১০০%	৭%
৬। মধ্যপ্রদেশ	১০০%	৭%
৭। উড়িষ্যা	১০০%	৭%
৮। রাজস্থান	১০৭%	শূণ্য
৯। তামিলনাড়ু	১০০%	৭%
১০। পাঞ্জাব	১০০%	৭%
১১। উত্তরপ্রদেশ	১০০%	৭%
১২। আসাম	৯০%	১৭%
১৩। বিহার	১০৭%	শূণ্য
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	৫৮%	৪৯%

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 8th Issue, December 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

অবশেষে জয়ী হল সংগ্রামী কিউবা

মাথা নোয়ালো ওয়াশিংটন, মাথা উঁচু করে করমর্দনের হাত বাড়ালো ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ। পাঁচ দশকের বিচ্ছিন্নতার পরে কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকে স্বাগতই জানিয়েছে বিশ্ব। সম্পর্ক স্থাপনকে অগ্রগতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে দুই চিরায়ত বৈরী দেশ। দু'দেশের সরকারী ঘোষণাতে স্পষ্ট দু'পা পিছু হটেই কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে সম্মত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ১৮ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাতে প্রায় একই সঙ্গে এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের কথা ঘোষণা করেন কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রো ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা। ১৯৫৯-এ কিউবায় বিপ্লবের পর থেকেই ফিদেল কাস্ত্রোর সরকারকে উচ্ছেদের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকা ওয়াশিংটনকে নীতি বদলে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আমেরিকায় বন্দী কিউবার তিন নাগরিক এবং হাভানায় কারারুদ্ধ মার্কিন গুপ্তচরকে মুক্তি দিয়ে এই সম্পর্ক স্থাপনের সূচনাও হয়ে গেছে। কিউবায় জাতীয় বীরের সম্মান পাওয়া মার্কিন জেলে বন্দী 'পাঁচ কিউবান'-এর দু'জন আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন। এবার স্বদেশে ফিরে এসেছেন জেরার্ডো হার্নান্ডেজ, আন্তোনিও গুয়েরো, রামোন লাবালিনো। স্বয়ং রাউল কাস্ত্রো হাভানার বিমানবন্দরে তাঁদের জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানান। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক প্রয়াসের পরে এই তিনজনের মুক্তিতে কিউবা জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। অপরদিকে, কিউবায় ধৃত মার্কিন গুপ্তচর অ্যালান গ্রসকেও 'মানবিক' কারণে মুক্তি দিয়েছে কিউবা। সম্পর্ক পুনঃস্থাপন হলেও মুখ্য প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়নি, স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন কিউবার রাষ্ট্রপতি। টেলিভিশন ভাষণে রাউল এই প্রায়-অসম্ভব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিতে হবে আমেরিকাকে। এই অবরোধ কিউবায় মানবিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। কার্যত আশির দশক থেকে চলতে থাকা এই অবরোধ ১৯৯২-এ টরিসেল্লি আইনে এবং চার বছর পরে হেমস-বার্টন আইনের মাধ্যমে আরো কঠোর করা হয়। রাষ্ট্রসঙঘসহ সমস্ত আন্তর্জাতিক মহলে চরমভাবে নিন্দিত এই অবরোধের ফলে তৃতীয় কোন দেশের পক্ষেই কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

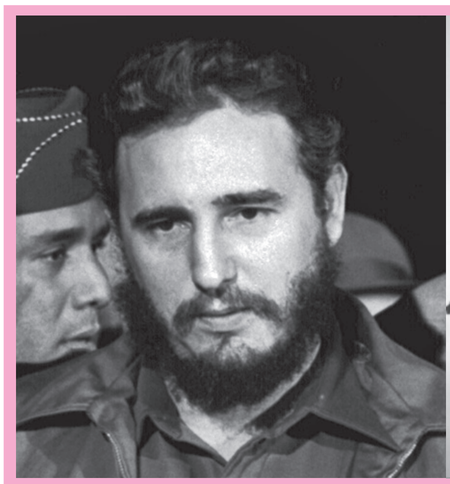

ফিদেল কাস্ত্রো

চে গুয়েভারা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কথাবার্তা প্রসঙ্গে রাউলের স্বচ্ছ মন্তব্য : মানবাধিকার, বিদেশনীতি, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দু'দেশের গভীর পার্থক্য রয়ে গেল। কিন্তু আমরা বরাবরই বলেছি পার্থক্য সত্ত্বেও সভ্য পদ্ধতিতে সহাবস্থানের কায়দা রপ্ত করতেই হবে। রাউল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'এক আউন্স নীতিও পরিত্যাগ না করেই এই সম্পর্ক স্থাপন।' আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, প্রায় এক বছর ধরে হাভানা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা চলেছে। সন্তর্পণে চলা এই আলোচনায় কিছু মধ্যস্থতা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস ও কানাডার সরকার। বস্তুত রাউল তাঁর ভাষণে এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ওবামার সঙ্গে রাউলের প্রায় এক ঘণ্টা টেলিফোনে আলোচনার পরে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। গত ৫৫ বছরে কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতিই কিউবার রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলেননি। নেলসন ম্যান্ডেলার শেষকৃত্যে ওবামা এবং রাউল কাস্ত্রোর করমর্দনের ছবি দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিয়েছিল। সেই শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঠিক এক বছরের মাথায় সম্পর্ক স্থাপনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করার অনমনীয় ও বস্তাপচা নীতি স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। কিউবায় অর্থনৈতিক সংস্কার এখনও প্রয়োজন, মানবাধিকারের উন্নতিও দরকার। কিন্তু এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চলতে হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হাভানায় আমেরিকা দূতাবাস খুলবে বলেও ওবামা জানান। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৫৪ বছরের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার কথা বিবেচনা করা হবে। মার্কিন নাগরিকদের কিউবা সফরের বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কিউবাকে 'সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা রাষ্ট্র' হিসাবে চিহ্নিত করার বর্তমান অবস্থানও পর্যালোচনা করা হবে। সাংবিধানিকভাবে কিউবা সম্পর্কে অবস্থান পরিবর্তনের এই অধিকার ওবামার থাকলেও তাঁকে দেশের অভ্যন্তরে নিশ্চিত বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে। ইতোমধ্যেই রিপাবলিকান নেতা জন ম্যাককেইন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'আমেরিকা পিছু হটছে, আমেরিকার অবক্ষয় ঘটছে।'

সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যে বাধ্য হয়েছে, তা নিয়ে তেমন দ্বিমত নেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহলে। কেন এই পশ্চাদপসারণ? পর্যবেক্ষকদের অভিমত, লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন অন্যতম বড় কারণ। এক সময়ে 'আমেরিকার উঠোন' বলে পরিচিত এই মহাদেশে একের পর এক দেশে বামমুখী, মার্কিন-বিরোধী সরকার তৈরি হয়েছে। ভেনেজুয়েলা থেকে নিকারাগুয়া, উরুগুয়ে থেকে বলিভিয়া, এমনকি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেও এই পরিবর্তনে কিউবার প্রেরণা স্পষ্ট উপাদান। মার্কিন ভূখণ্ডের ৯০ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে থেকেও এই পরাক্রমশালী শক্তিকে মাথা নোয়াতে বাধ্যই করেছে কিউবা। তার ধাক্কা পড়েছে ওয়াশিংটনের অভ্যন্তরীণ নীতিতেও। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমেরিকার অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া চাপ। হিস্পানিক নাগরিকদের মধ্যে থেকে সেই চাপ যেমন এসেছে, তেমন অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগতে থাকা মার্কিন বাণিজ্য মহলের একাংশও কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে চাপ দিচ্ছিল। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো বলেছেন, 'এই জয় কিউবার, এই জয় ফিদেলের।' □ *অরিন্দম ব্যানার্জী*

পাকিস্তানে নৃশংস হামলা তালিবানীদের

স্কুলে ঢুকে শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হল

বনের হিংস্র পশুকেও লজ্জিত করার মত বর্বর কাণ্ড ঘটালো তালিবানীরা। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪, পাকিস্তানের পেশোয়ারের ওয়ারশাক রোডের আর্মি পাবলিক স্কুলে ঢুকে তেহরিক-ই-তালিবান সন্ত্রাস-বাদীরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে খুন করল দেড়শতাধিক স্কুলের পড়ুয়া বাচ্চাকে। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই সন্ত্রাসবাদী দলটি স্কুলে ঢুকেই এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। ক্লাসে ক্লাসে ঢুকে তারা নিরীহ শিশুদের খুন করতে শুরু করে। সরকারীভাবে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। ছয়জন জঙ্গীর মধ্যে চারজন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিয়েছে। বাকি দু'জনকে খতম করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। তবে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা নিয়ে ধন্দ আছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দুই স্কুল শিক্ষিকাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সেনা আধিকারিকরা। পেশোয়ার লাগোয়া উপজাতি শিবির ওয়াজিরিস্তান এলাকায় পাক সেনা অভিযানের বদলা হিসাবেই এই শিশুঘাতী বিভৎস হামলা চালানো হয়েছে বলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি জানিয়েছে। ভারত সহ প্রতিটি দেশ এই জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলেছেন, পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল না করা পর্যন্ত এই লড়াই চলবে। তেহরিক-ই-তালিবানের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করবে পাক সেনা। এই নৃশংস ঘটনার জন্য পাকিস্তানে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক প্রতিপালিত হয়েছে। □

আসামে উগ্রপন্থীদের তান্ডব

গত ২৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, উপর্যপুরি উগ্রপন্থী হানায় রক্তাক্ত হল আসামের মাটি। মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের। জখম হয়েছেন ৯০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আক্রমণকারীরা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ডের সংবিজিৎ গোষ্ঠীভুক্ত। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কোকড়াঝাড় এবং সোনিতপুর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত পাঁচটি গ্রাম। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উগ্রপন্থীরা আদিবাসী গ্রামগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনিতপুরের বিশ্বনাথ চারিয়ালি ১০নং ফুলবাড়ি গ্রাম। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামটিতেই নিহত হয়েছেন ৩৭জন। ওই জেলারই ঢেকিয়াজুলি গ্রামেও আরও দু'জনের দেহ পাওয়া গেছে। কোকড়াঝাড় জেলার ভোটিয়াঝুরি মধুপুর হাতিয়ালিতে নিহত হয়েছেন ৮ জন। ভারত-ভুটান সীমান্তের কাছে সোরফান গুড়ির লুঙসুঙ ও পাকুরিগুড়ি গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৫ জনের মরদেহ। পাকুরিগুড়ি গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন। মৃতদের মধ্যে ২১ জন মহিলা ও ১৮ জন শিশু।

যেভাবে একযোগে একাধিক গ্রামের ওপর হামলা করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করার জন্য গ্রামগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে আক্রমণগুলি সংগঠিত হয়। অনেক রাত পর্যন্ত সব ঘটনাস্থলে পুলিশবাহিনী পৌঁছতে পারে নি। গ্রামবাসীরাই জখম ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুলিশ সূত্রের অনুমান হ'ল সংবিজিৎ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক পুলিশী অভিযানের বদলা নিতেই এই পরিকল্পিত আক্রমণ। গত একমাসে পুলিশী অভিযানে বেশ কয়েকজন উগ্রপন্থীর মৃত্যু হয়েছে। এই আক্রমণের ঠিক আগেই তিনজন উগ্রপন্থী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পাল্টা আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কা পুলিশের ছিলই। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল, পাল্টা আক্রমণের লক্ষ্য হবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলি। কারণ সাম্প্রতিক অতীতে সংবিজিৎ গোষ্ঠী আক্রমণ সংগঠিত করেছে মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশী এমন এলাকাগুলিতে বাড়তি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই সম্ভবত মুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে আদিবাসী এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

এই নিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকবার অশান্ত হয়ে উঠল আসাম। ২০১২ সালে বোড়ো জনগোষ্ঠী নিবিড় জেলাগুলিতে জাতিদাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। ঘরছাড়া হয়েছিলেন লক্ষাধিক। চলতি বছরেও বোড়ো টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অন্তর্গত চারটি জেলা বাকসা, কোকড়াঝাড়, উদলগুড়ি এবং চিরাঙে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনায় ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে সরকারী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাঁদের অনেকেই আজও ঘরে ফিরতে পারেন নি। এই নৃশংস আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ আদিবাসীরা বেশ কয়েকটি জায়গায় বোড়োদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়। পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে কয়েক হাজার আদিবাসী তীর-ধনুক নিয়ে থানা আক্রমণ করতে গেলে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এতে পাঁচজন আদিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় গ্রামবাসীরা রেলপথ ও সড়কপথ অবরোধ করে। হাজার হাজার মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে সরকারী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠাতে অনুরোধ করেছে। ৫ হাজার আধা সামরিক জওয়ানকে আসামে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অগ্নিগর্ভ আসাম থেকে প্রাণ হাতে করে কয়েক হাজার মানুষ পালিয়ে এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। ঐ জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন তাঁরা। এই অসহায় বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে নিয়েও রাজনীতি করতে ছাড়ে নি এই রাজ্যের শাসকদল। গত ২৭ ডিসেম্বর কপ্টারে চেপে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে যাবেন বলে, তীব্র শীতের মধ্যে কুমারগ্রাম ব্লকের কমিউনিটি হলের মাঠে তাঁদের পাঁচঘণ্টা ধরে বসিয়ে রাখা হল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতেও তাঁদের বাধ্য করা হল। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।